জানুয়ারি ২০২০ ❑ পৌষ - মাঘ ১৪২৬

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও ক্ষণগণনা শুরু

পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসব

স্বর্ণা রহমান, একাদশ শ্রেণি, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা

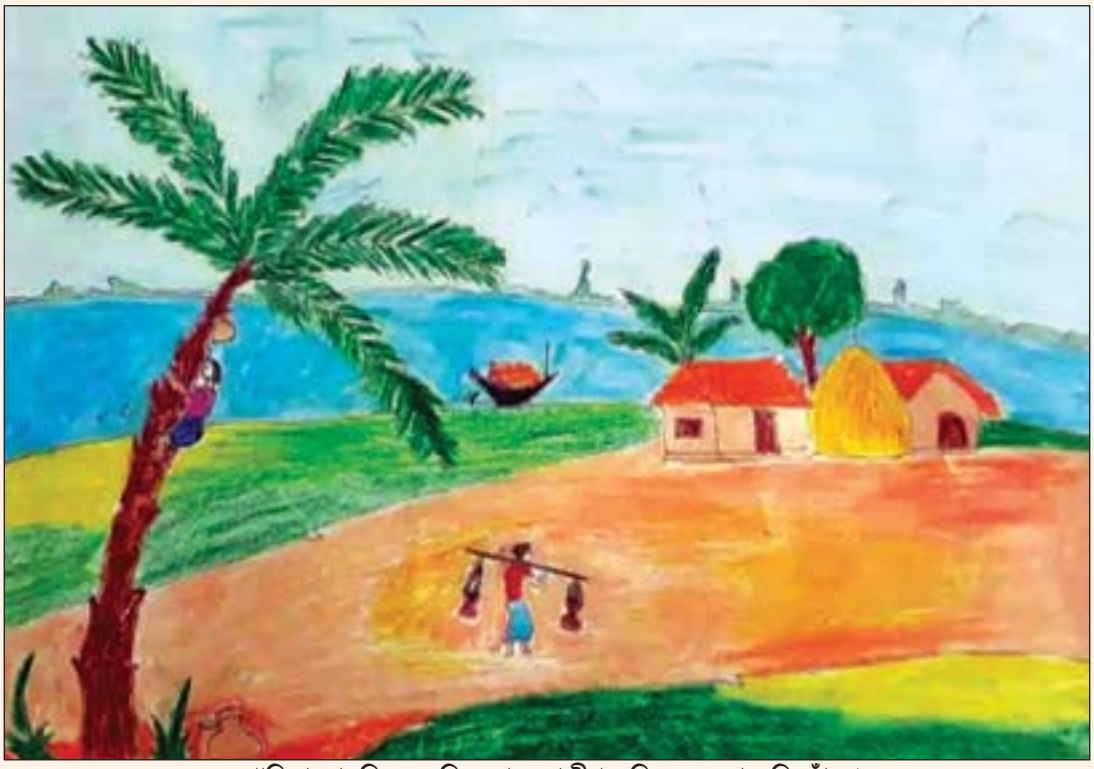

শারিকা তাসনিম, কেজি ওয়ান, হাজীগঞ্জ চিল্ড্রেন একাডেমি, চাঁদপুর

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

জানুয়ারি ২০২০ ❑ পৌষ-মাঘ ১৪২৬

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফফাত আঁখি

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

তোমাদের সবাইকে ইংরেজি নতুন বছর ২০২০-এর আন্তরিক শুভেচ্ছা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানুয়ারির প্রথম দিনেই এদেশের শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দেন নতুন ক্লাসের নতুন বই। বিনামূল্যে পাওয়া নতুন বইয়ের ঘ্রাণই আলাদা, তাই না বন্ধুরা।

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। এই দিনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসেন স্বাধীন বাংলাদেশে। সেই থেকে জানুয়ারি মাস ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। ২০২০-২০২১ সালকে 'মুজিববর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে বর্তমান সরকার। ঐতিহাসিক ১০ই জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা।

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বেঁচে থাকলে বঙ্গবন্ধু এ বছর পালন করতেন জন্মের শত বছর। বঙ্গবন্ধু না থাকলেও অসীম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ বাংলাদেশ পালন করবে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী।

সূচি

নিবন্ধ

০৫ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও ক্ষণগণনা শুরু
শাহানা আফরোজ

০৯ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও আমরা ক'জন/ ড. মো. মাহামুদ -উল-হক

১৫ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসব/ মেজবাউল হক

২৬ বাংলাদেশের প্রজাপতি/ ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

৪৮ বাদুড় রহস্য/ সৈয়দা নাদিয়া হক

৪৯ বন্ধু তিতলি/ কাজী তাবাসসুম আহমেদ

৫৩ আইমানের অ্যাপ/ নওশের আলম

৫৪ শিশুদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আনন্দমুখর দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

৫৬ বিশেষ শিশুদের জন্য ভালোবাসা
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

৫৮ করোনা ভাইরাস থেকে সাবধান
মো. জামাল উদ্দিন

৬০ জেএসসি ও পিইসি দুটোতেই মেয়েরা এগিয়ে
জান্নাতে রোজি

৬৩ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

শিশুতোষ গল্প

১৬ খুদে পাঠক, খুদে লেখক/ ওবায়দুল মুন্সী

ভাষা দাদু

৩৯ দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন/ তারিক মনজুর

ঐতিহ্য

৪১ ঐতিহ্যবাহী সাকরাইন বা ঘুড়ি উৎসব
মো. সরোয়ার হোসেন

৪৭ বাংলাদেশের কাঠের তৈরি মসজিদ
বাদল রহমান

গল্প

১৮ সততা স্টোর/জুবাইর জসীম

২০ মেঘকন্যা আর বাচ্চা ভূত/খায়রুল আলম রাজু

৩১ অন্যরকম জন্মদিন/ সৈয়দা নাজমুন নাহার

৩৩ ফুলকি দুলকি/ মমতাজ খান

৩৬ কেমন জব্দ/ আয়েশা তাসনিম রইতা

৪৪ মায়াবী ঘুমের গল্প/ মোস্তাফিজুল হক

৫০ দ্বন্দ্ব/ ফজলে রাব্বী দ্বীন

কবিতা

০৩ শাফিকুর রাহী

১৯ লুৎফর রহমান রবি

২২ নাসির উদ্দিন

২৩ বাতেন বাহার/ আমীরুল ইসলাম

২৪ দেলওয়ার বিন রশিদ/ শেখ সালাহ্‌উদ্দীন/
কাজী নাদিয়া তাসনিম প্রিয়ন্তি

২৫ শরীফ আব্দুল হাই/ আজমেরী সুলতানা/
ডা. আয়েশা আক্তার

৫৫ মো. নিয়াজ আহমেদ/ সাবরিনা খাতুন

৫৯ আফিয়া ইবনাত

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: স্বর্ণা রহমান, শারিকা তাসনিম
শেষ প্রচ্ছদ: শুচী ইসলাম

০৮ আনিশা চৌধুরী

৩২ ফারাহনাজ সিদ্দিকী সিমিন

৫৫ মো. নিয়াজ আহমেদ, সাবরিনা খাতুন

৫৭ মো. ইসফাক কাদের

৬১ তাশদিদ তাবাসুম

৬২ মো. ইহসানুল হক সিফাত, সানজিদা আক্তার রূপা

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

প্রত্যাবর্তনের গান

শাফিকুর রাহী

বীরদর্পে ফিরল দেশে সোনার জিয়ন কাঠি
আনন্দ অশ্রুতে ভাসে বাংলাদেশের মাটি।
জাতির পিতার আগমনে সুখ-আনন্দ বানে
মাটি মানুষ উঠল হেসে দুঃখ ভোলার গানে।
প্রাণের টানে লাখো মানুষ আনন্দ উল্লাসে
আবেগেরই শ্রাবণধারা বইল যে বাতাসে।
চাঁদ-সুরুজের কোলাকুলি দূর আসমানের কোলে,
জয়বাংলারই জয়ধ্বনিতে নায়েরই পাল দোলে।

বিরান বসতভিটে হাসে রক্তগোলাপ হাসি-
ঘরদোর হারা উঠল জেগে হাসল মা ও মাসি।
রক্ত নদীর স্রোতে ভাসে পবিত্র এই ভূমি-
দেশের জন্য জীবন দিল লাখো রহিম রুমি।
বীর গেরিলা ধ্বংস করল যুদ্ধবাজের ঘাঁটি,
বিশ্বটাকে চমকে দিল নায়ের বৈঠা লাঠি।
ফিরল দেশে আশার আলো বাংলাদেশের প্রাণ;
দুঃখ ভুলে গাইল সবাই জয়বাংলার গান।

বোনের অশ্রু ভাইয়ের রক্ত বীরের জীবন দানে,
শত্রুমুক্ত স্বদেশভূমি রেসকোর্স উদ্যানে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আলোরই সাম্পানে,
আবেগিত ভাষণ দিলেন সুখ-আনন্দ বানে।
ত্যাগের মহান গর্ব গাথায় গড়ব স্বদেশ মাকে,
দুঃখ ভোলার গান বাজল আকাশ-নদীর বাঁকে।
নায়ের বৈঠা লাঠি হাতে বীর গেরিলা ছোটে,
ভয়কে জয়ের যুদ্ধে মাতে বারুদ হয়ে ফোটে।

পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি জাতির পিতা,
বীর বাঙালির মুক্তিরই দূত চিরকালের মিতা।
বিশ্বকে বিস্মিত করে মুক্ত স্বাধীন দেশে,
ফাঁসির আদেশ বাতিল করে ফেরেন বীরের বেশে।
লাখ শহিদের রক্তে ভেজা পবিত্র এই মাটি,
বঙ্গবন্ধুর স্নেহের পরশ বুনে শীতলপাটি।
প্রত্যাবর্তনের গান যে বাজে নিরন্নদের প্রাণে,
মানবতার পরম বন্ধুর অনন্ত উত্থানে।

উনিশ'শ বাহাত্তর সালের দশই জানুয়ারি,
বিশ্বজয়ের বীর গরিমায় ঝরিয়ে চোখের বারি-
জানান দিলেন জাতির পিতা সোনার বাংলা গড়তে
স্বজনহারার ব্যথা ভুলে আরেক যুদ্ধে লড়তে
এ লড়াইয়ে জয়ী হলেই 'আমার' জীবন ধন্য,
তোমাদের এই মহৎ ত্যাগের ইতিহাস অনন্য।
বীর বাঙালি সারাবিশ্বে গর্বিত এক জাতি,
দেশের জন্য জীবন দিল ভাঙলো আঁধার রাতি।

আমার দীর্ঘ দুঃখ-কষ্ট তোমাদেরই জানা,
এ দেশ এবং তোমরা আমার আপন ঠিকানা।
আমার সংগ্রাম সফল হলো মুক্ত আকাশ মাটি,
প্রাণের প্রিয় বাংলা আমার সোনার চেয়ে খাঁটি।

নিবন্ধ

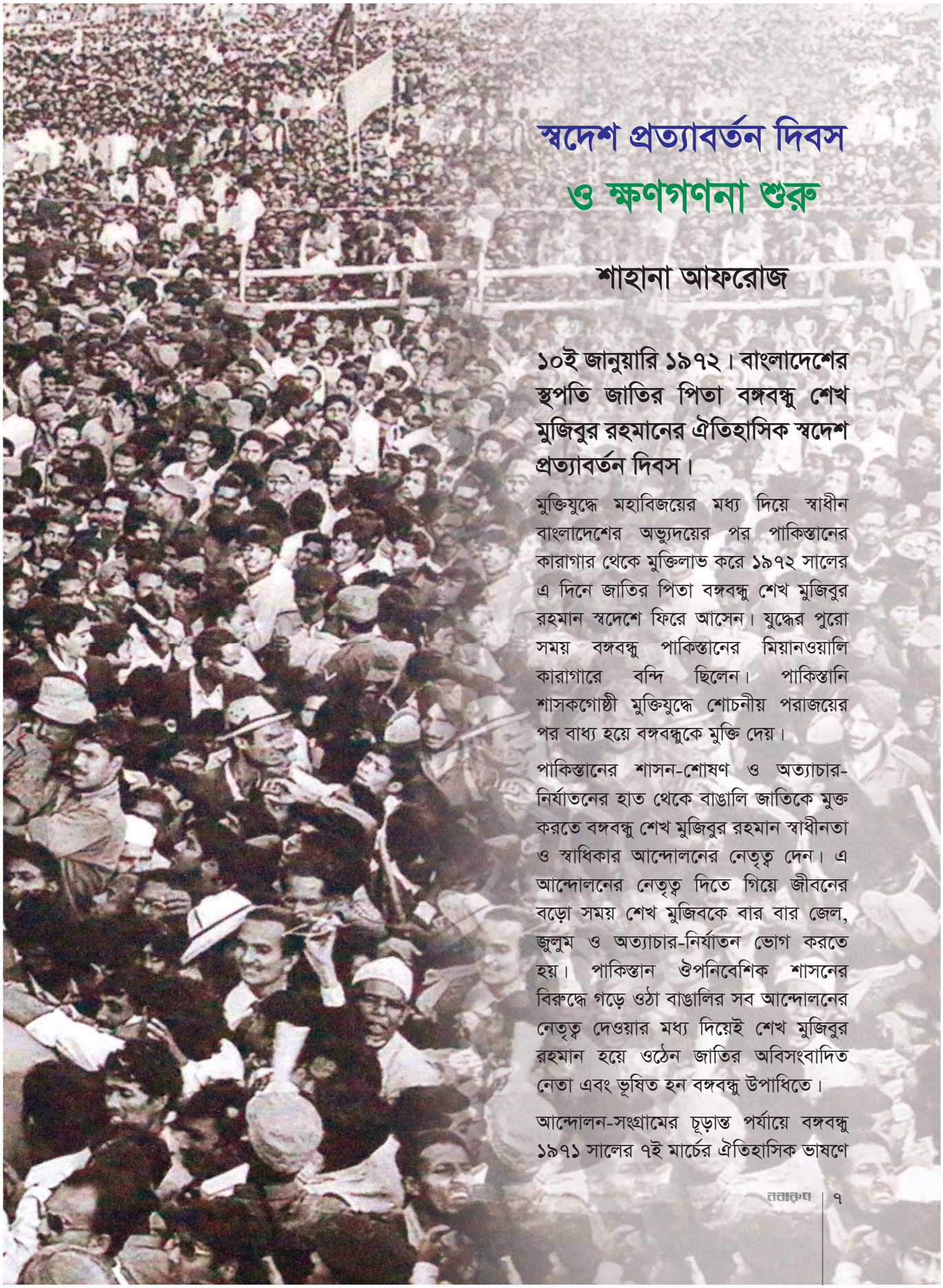

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও ক্ষণগণনা শুরু

শাহানা আফরোজ

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস।

মুক্তিযুদ্ধে মহাবিজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে ১৯৭২ সালের এ দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশে ফিরে আসেন। যুদ্ধের পুরো সময় বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারে বন্দি ছিলেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর বাধ্য হয়ে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়।

পাকিস্তানের শাসন-শোষণ ও অত্যাচার-নির্যাতনের হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে জীবনের বড়ো সময় শেখ মুজিবকে বার বার জেল, জুলুম ও অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করতে হয়। পাকিস্তান ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা বাঙালির সব আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়েই শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন জাতির অবিসংবাদিত নেতা এবং ভূষিত হন বঙ্গবন্ধু উপাধিতে।

আন্দোলন-সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে

বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। ২৫শে মার্চ কাল রাতে পাকিস্তানি বর্বর হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গণহত্যা চালায়। এ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর পর পরই বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

শুরু হয় বাঙালির সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। এ সময় বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি রেখে তাঁর উপর নির্যাতন চালানো হয়। পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার নানা পরিকল্পনা তৈরি করে। জেলের মধ্যে অত্যাচার নির্যাতনই শুধু নয়, তাঁকে ফাঁসির মঞ্চেও নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু দেশে-বিদেশে বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা ও তাঁর অদম্য সাহসের কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এবং সেনাবাহিনী। মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনীর যৌথ প্রতিরোধের মুখে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এত রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে বিজয় এলেও মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় বাঙালির অর্জিত বিজয় পূর্ণতা পায়নি। বিজয়ী বাঙালি জাতি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে তাদের নেতার ফিরে আসার।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বিশ্বব্যাপী বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা আরো বাড়তে থাকে। বাঙালির পাশাপাশি বিশ্বের স্বাধীনতা ও শান্তিকামী মানুষও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠে। আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে অবশেষে ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু লন্ডনে চলে যান। সেখান থেকে ভারত হয়ে ১০ই জানুয়ারি স্বদেশে ফেরেন।

সেদিন সারা দেশ থেকে মানুষ ছুটে আসেন তাদের নেতাকে একবার দেখার জন্য। স্বাধীন দেশে ফিরে বাঙালির ভালোবাসায় সিক্ত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিমানবন্দর থেকে বঙ্গবন্ধুকে মিছিল সহকারে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) নিয়ে আসা হয়। এই চার মাইল পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে আড়াই ঘণ্টা। মৃত্যুর দুয়ার থেকে মুক্ত স্বদেশের বুকে ফিরে এসে প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে আনন্দ, আবেগ আর কান্নায় বার বার তাঁর কণ্ঠ ভারী হয়ে আসছিল। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় পৃথিবীর কোনো খবরই আমার কাছে পৌঁছত না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, বাঙালির সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই, আমার দেশ স্বাধীন হবেই। আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার জন্য কবরও করা হয়েছিল। আমি ভাবিনি, আমি ফিরে আসতে পারব। আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে। তবে মনে বিশ্বাস ছিল, আমি মুসলমান, মৃত্যু আমার আল্লাহর হাতে। আল্লাহর রহমত ছিল, আপনাদের দোয়া ছিল, তাই আমি আবার দেশের মাটিতে আপনাদের মাঝে ফিরে আসতে পেরেছি। এ যেন অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা'।

বঙ্গবন্ধু যেদিন দেশে ফিরে এলেন সে সময় ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। মুজিবনগর সরকারের নেতারা বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে দেশকে স্বাধীন করতে সক্ষম হলেও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উদ্ভূত কঠিন ও জটিল সমস্যাগুলোর যথাযোগ্য সমাধান করতে পারছিলেন না। বঙ্গবন্ধু তখন ফিরে না এলে মাত্র ১০ মাসের মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন এবং সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক পথে জাতির অগ্রযাত্রা সম্ভবপর হতো না। আর এসব কারণেই বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ছিল এক বিশেষ তাপর্যপূর্ণ ঘটনা।

মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ের ২৪ দিন পর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি নিজের স্বপ্নের স্বাধীন দেশে পা রাখেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কাঙ্ক্ষিত সেই মানুষটির বাংলার মাটিতে পা রাখার মধ্য দিয়েই সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে ১০ই জানুয়ারিতে বাংলার রাজনীতির মুকুটহীন সম্রাট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির

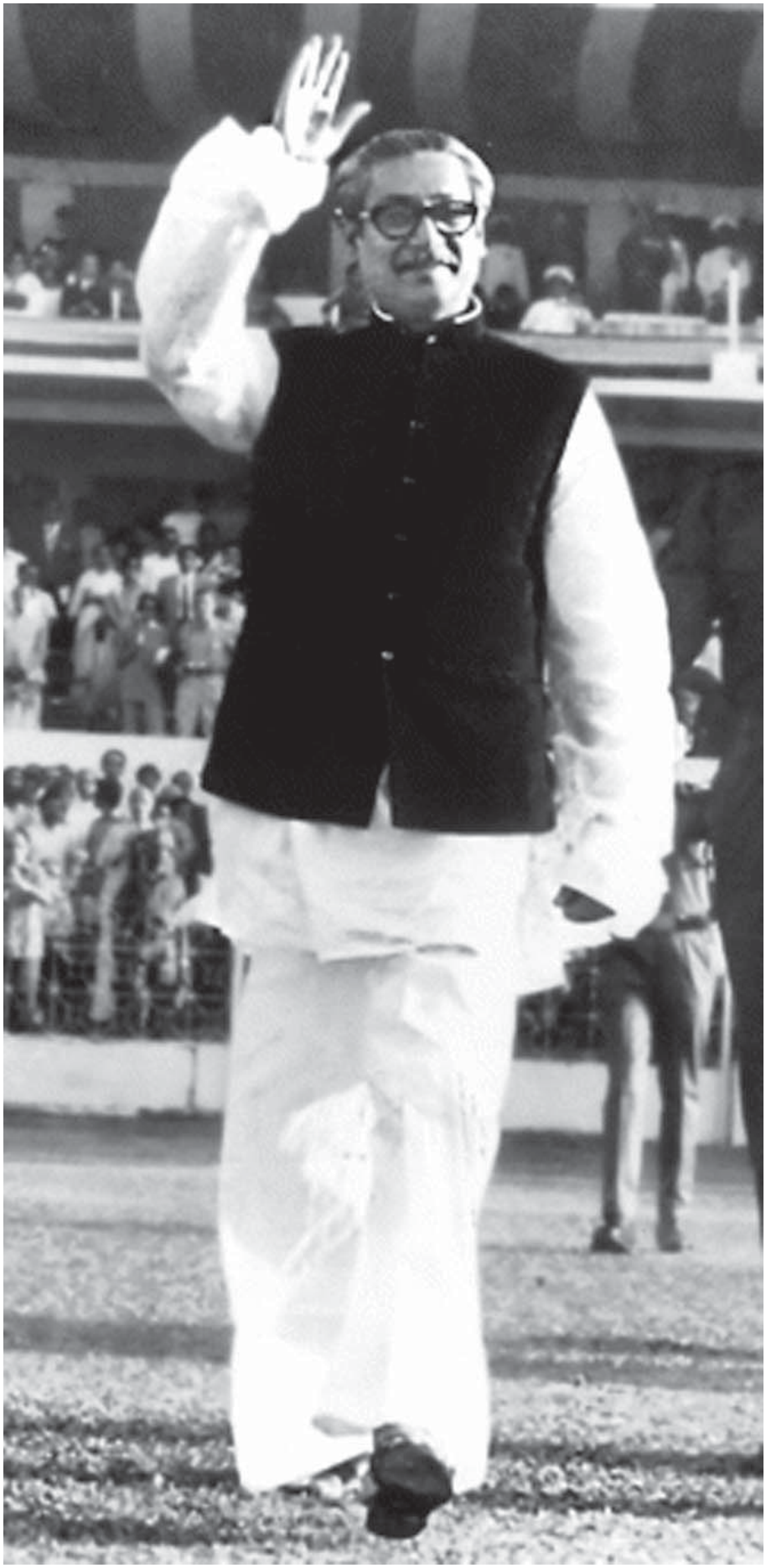

পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পেয়ে বাঙালি বিজয়ের পরিপূর্ণ আনন্দ প্রাণভরে উপভোগ করেছে। ঐদিনই বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রবেশ করে গণতন্ত্রের এক আলোকিত অভিযাত্রায়।

ফিরে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ

১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। প্রতি বছর পালিত হলেও ৪৮ বছর পর এবার আয়োজনে ভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে এসেছে 'মুজিববর্ষ'। বেঁচে থাকলে এই বছর ১৭ই মাচ ১০০ বছর পূর্ণ করতেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর তাই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী ঘটা করে উদ্‌যাপন করবে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশ। জন্মশতবাষির্কীর ক্ষণগণনা শুরু হয়েছে তেজগাঁওয়ের পুরনো বিমানবন্দরের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের অনুষ্ঠান থেকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে বিকাল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডের মঞ্চে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মূল অনুষ্ঠানের শুরুতে ল্যাপটপের

বোতাম চেপে প্রধানমন্ত্রী মুজিববর্ষের লোগো উন্মোচন ও ক্ষণগণনার উদ্‌বোধন করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর হাতে লোগো তুলে দেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

দেশের ১২টি সিটি করপোরেশনের ২৮টি স্পটে, ৫৩ জেলায় ও দুটি উপজেলা মিলিয়ে মোট ৮৩টি জায়গায় বসানো কাউন্টডাউন ক্লকও সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে যায়।

এরপর পুরাতন বিমানবন্দরে অবতরণ করে একটি উড়োজাহাজ। পাকিস্তানের কারগার থেকে মুক্তি পাওয়ার দুই দিন পর লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি অপরাহ্নে ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্সের এরকম একটি উড়োজাহাজে করেই তেজগাঁওয়ের বিমানবন্দরে পৌঁছান বঙ্গবন্ধু। বিমানটি ধীরে ধীরে এসে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে এসে থামে। এ সময় বাজানো হয় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের সেই গান- 'বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায়'। বিমানটি টারমাকে পৌঁছানোর পর দরজা খোলা হলে ২১ বার তোপধ্বনি দেওয়া হয়। পতাকা হাতে ১৫০ জন তখন লালগালিচার পাশে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানায়। তাদের জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান আর লেজার লাইটের মাধ্যমে বিমানের দরজার ফুটিয়ে তোলা হয় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে সেই আলোকবর্তিকা ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে লালগালিচার মাথায় ছোট্ট মঞ্চে এসে থেমে যায়। এরপর গার্ড অব অনার প্রদান করে সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল। বঙ্গবন্ধু যে আলোকবর্তিকা হয়ে সেদিন দেশে ফিরেছিলেন, তারই প্রতীকী উপস্থাপনা ছিল এ আয়োজনের উদ্দেশ্য।

পিতার ফিরে আসার ঘটনার উপস্থাপন দেখে আবেগতাড়িত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'সেদিনটিতে আমরা হয়ত বিমানবন্দরে আসতে পারিনি, তখন আমার বাচ্চাটি ছোটো ছিল, আমরা এমন অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু আমার মনে পড়ে মা সর্বক্ষণ একটি রেডিও নিয়ে বসেছিলেন, ধারাবাহিক বিবরণ শুনছিলেন, আমরা পাশে বসে সারাক্ষণ ধারা বিবরণী শুনেছিলাম'।

বঙ্গবন্ধুকন্যা আরো বলেন, 'চলুন আজকের দিনে আমরা সেই প্রত্যয় নিই যে, এই বাংলাদেশ কারো কাছে মাথা নত করে না, বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতি মাথা উঁচু করে বিশ্বে চলবে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন সেই সোনার বাংলা ইনশাআল্লাহ আমরা গড়ে তুলব।' ■

আনিশা চৌধুরী, জুনিয়র টু, ম্যাপল লীফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও আমরা ক'জন

ড. মো. মাহামুদ-উল-হক

১৯৮৩ সালের ঘটনা। আমি তখন চট্টগ্রাম কলেজের রসায়ন বিভাগের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। শেরে বাংলা হোস্টেলে থাকি। আমরা ক'জন হোস্টেলে খুবই নিবিড়ভাবে ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে কাজ করি। তার মধ্যে মোস্তফা কামাল উদ্দিন, হেলাল উদ্দিন আহমদ, আবুল কাশেম এবং হারুন অর রশীদও ছিল। মফিজুর রহমান, যিনি পরে ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন, আমাদের এক ব্যাচ সিনিয়র। ছাত্রলীগের তখনকার অবস্থা বেশ সঙ্গিন ছিল। ছাত্রলীগকে কোণঠাসা করে রেখেছিল ইসলামি ছাত্রশিবির। ছাত্র শিবিরের মারমুখো আচরণে রাজনীতি করাও অনেক কঠিন ছিল। তারপরও আমরা অত্যন্ত সংঘটিত ছিলাম বিধায় প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিলাম।

ছাত্রলীগ করতেন এমন উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে আরো ছিলেন শফিউল আলম, নাসের রহমান, সরওয়ার আলম ও জমির উদ্দিন প্রমুখ। শফিউল আলম চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র সংসদ ছাত্রলীগের প্রথম নির্বাচিত ভিপি। অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী ছিলেন। নাসের রহমান সম্পর্কে আমার চাচা হন। তিনি একজন লেখক ও সাহিত্যিক। ছোটোবেলা থেকেই সংস্কৃতিমনা। শেরে বাংলা হোস্টেলে ছাত্রলীগের একটি কমিটি গঠন করা হয় শফিউল আলম ও নাসের রহমানের নেতৃত্বে। আমাকে কমিটির সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নাসের রহমান মনে করতেন সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ছাড়া রাজনীতির উন্নয়ন সম্ভব নয়।

চট্টগ্রাম শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ঘেরা পাহাড়ের পাদদেশে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে অনেকটা গ্রামীণ

পরিবেশ। তখনকার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি শহরের ওপর খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারত না। তবুও ছাত্রদের মধ্যে কিছুটা যোগাযোগ থাকত। রাজনীতির কিছু কিছু কর্মসূচি যৌথভাবে সম্পন্ন হতো।

একদিন সকালবেলা ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় ক'জন চট্টগ্রাম কলেজের শেরে বাংলা হোস্টেলে আসেন। তারা এসে শেখ রেহানার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে কর্মসূচি ঠিক করছিলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর স্বৈরশাসকগণ জাতির পিতার কন্যাদের দেশে আসতে প্রবলভাবে বাধা দেয়। শত বাধা অতিক্রম করেও শেখ হাসিনার পর শেখ রেহানা স্বদেশে আসার জন্যে উদ্যোগ নেন। শেখ রেহানা বিদেশের মাটিতে অত্যন্ত জোরালোভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করে আসছিলেন। যার কারণে স্বৈরশাসকগণ তাঁর স্বদেশে আসার সকল পথ রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। কোনো বাধা সেদিন তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন প্রতিহত করতে পারেনি। যেমন পারেনি শেখ হাসিনার স্বদেশে ফেরা।

চট্টগ্রাম থেকে একটা বাসে করে ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা শেখ রেহানাকে বরণ করার জন্য ঢাকা কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে যে ক'জন ঢাকা যেতে আগ্রহী তাদের একটি তালিকাও আমরা তৈরি করলাম। এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ও আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর আর্থিক সহায়তায় একটি বাস দেওয়া হবে বলে জানা গেল। মহিউদ্দিন চৌধুরী ও আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু সে সময়কার চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের দুই দিকপাল। দলের প্রতি তাঁদের কর্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্বপরায়ণতা এবং ত্যাগের মহিমায় আওয়ামী লীগ প্রতিকূল পরিবেশেও সে সময় দিকহারা হয়নি। এই দুই মহান নেতার যোগ্য নেতৃত্ব চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছে বলেই চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের শক্ত অবস্থান। বিশেষ করে দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে মহিউদ্দিন চৌধুরীর যে দৃঢ় প্রত্যয় তা আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নে একজন একনিষ্ঠ সৈনিক।

ঢাকা যেতে যেহেতু একটি বাস পাওয়া গেল সে কারণে ছাত্রদের কোনো বাস ভাড়া লাগবে না বলে আমাদের জানানো হলো। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিষয়টি তদারকি করেন আলাউদ্দিন নাসিম। আলাউদ্দিন নাসিম আমাদের এক ব্যাচ সিনিয়র। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আমরা মোটামুটি স্থির করলাম শেখ রেহানা-কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ঢাকায় যাব। পাঁচ-ছয় জনের একটি তালিকা করা হলো। তবে

খুব বেশি সাড়া পাওয়া গেল না। আমি এবং হারুন স্থির করলাম ঢাকায় গিয়ে জাতির পিতার কন্যা শেখ রেহানাকে কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে স্বাগত জানাবো। আমাদের প্রবল ইচ্ছেও ছিল বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৩২ নম্বরের বাসায় গিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির নিদর্শনগুলো দেখার।

২০শে জানুয়ারি, ১৯৮৩ । চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক ছাত্র একটি বাস নিয়ে চট্টগ্রাম কলেজে আসে। আমরা ক'জন প্রস্তুতি নিলাম ঢাকা যাব। ছোটো একটি ব্যাগ নিয়ে বাসে উঠলাম। সময় তখন সকাল ১০টা। ৩৬ সিটের একটি বাস। দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিলে ২০-২৫ জনের একটি দল একত্রিত হলাম। সকলে মিলে যথারীতি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। টানা ছয়-সাত ঘণ্টা বাস চলার পর বিকেল ৫টায় ঢাকায় এসে পৌঁছলাম। আমার এর আগে ঢাকায় দুই-একবারের বেশি আসা হয়নি। ঢাকা শহর খুব একটা চিনি তাও না। আমার জন্য অনেকটা নতুন শহর। আবার শহরের এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াবো সে সাহসও ছিল না।

ঢাকায় এসে আমরা উঠলাম সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে। 'সার্জেন্ট জহুরুল হক' কে ছিলেন তাও তখন জানতাম না। পরে অবশ্য আবাসিক ছাত্রদের কাছ থেকে এ ইতিহাস জেনে নিলাম। তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৩৫ জনের একজন আসামি ছিলেন। বন্দি অবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হয়। সার্জেন্ট জহুরুল হকের সংগ্রামী চেতনা, ত্যাগ এবং বীরত্বের কথা জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের একটি হলরুমে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। আমাদের জন্য একটি চাদর ও একটি বালিশ কোনোভাবে জোগাড় হলো। তবে কোনো মশারি ছিল না। সে সময় মশার উৎপাত অনেক বেশি ছিল। একটা মশার কয়েল অতি কষ্টে জোগাড় করা গেল। যা অন্তত মশার ঘ্যানঘ্যান শব্দ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে কাজে আসবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসাটা আমাদের জন্যে স্বপ্নের ব্যাপার ছিল। তদুপরি এই ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান এবং রাত্রিযাপন করাও কল্পনার বাইরে ছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত এল। আমরা কোথায় যাব, কী খাব তাও জানা ছিল না। কিছুক্ষণ পর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রনেতা আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। শুনলাম তিনি মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন। মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন তখন ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছিলেন। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কর্মসূচি তার নেতৃত্বেই পরিচালিত হতো। তিনি এসে আমাদের সাথে কথা বললেন। তিনিই সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে আমাদের রাতের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। উপস্থিত ছাত্র-নেতাদের পক্ষ থেকে একটি দাবি ছিল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করার। যেহেতু আমরা সুদূর চট্টগ্রাম থেকে এসেছি, সেজন্য আমাদের প্রবল আগ্রহ আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করা। মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনই একমাত্র ভরসা নেত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে দেওয়ার জন্য।

মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনকে জোরালো অনুরোধ করা হলো কোনোভাবে নেত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করা যায় কিনা সে ব্যবস্থা করতে। তিনি আমাদের কথা দিলেন চেষ্টা করবেন। তিনি বললেন শেখ ফজলুল করিম সেলিমের কথা। তিনি জানালেন, শেখ সেলিমই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমাদের এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

পরের দিন কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে যাবার কর্মসূচি ছিল। মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন আমাদের বিমানবন্দরে যাওয়া এবং শেখ রেহানাকে অভ্যর্থনা জানানোর সকল পরিকল্পনা বুঝিয়ে বললেন। ২১শে জানুয়ারি সকালে আমাদের জহুরুল হক হল থেকে সাড়ে ১২টায় বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে। সেভাবে আমাদের প্রস্তুত থাকার জন্য বলে তিনি চলে গেলেন।

রাতের খাবার খাওয়ার আগেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে দেখার জন্য বের হলাম। কয়েকজন ছাত্রনেতা আমাদের বিভিন্ন হল ঘুরে ঘুরে দেখালেন। তাদের মধ্যে একজন নেতার বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে। হঠাৎ করে তার সাথে দেখা। আমি যখন চট্টগ্রাম কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র ছিলাম তখন সেও আমাদের সাথে চট্টগ্রাম কলেজে পড়ত। আমি চট্টগ্রাম কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে 'এ' সেকশনে ছিলাম। সে ছিল 'সি' সেকশনে। চট্টগ্রাম কলেজে ছাত্রাবস্থায় সে

ছাত্র শিবিরের একজন সক্রিয় সদস্য ছিল। তার নাম শফিউল আযম। আমরা তাকে শফি বলে ডাকতাম। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সে ছাত্রলীগে যোগদান করে বলে জানায়। আমি একটু বিস্মিত হলাম তার এই পরিবর্তন দেখে। জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী? তার এত পরিবর্তন কেন? তার উত্তর খুবই সোজা। ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে সুযোগ-সুবিধা নেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। শফির কর্মতৎপরতা দেখে ধারণা হলো সে এখন একজন প্রভাবশালী নেতা। তাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে। তার রাজনীতির এ পরিবর্তন অবাক হবার মতো হলেও যুগে যুগে সুযোগ সন্ধানীরা ব্যক্তি স্বার্থে দলবদল করে থাকে। এটাই বাস্তবতা।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে আমরা যথারীতি জহুরুল হক হলে ফিরে আসি। রাতের খাবার গ্রহণ করার জন্য ডাইনিং হলে যাই। ডাইনিং হলে গিয়ে দেখি টেবিলে মোটা চালের ভাত, সবজি ও পাতলা ডাল আমাদের জন্য পরিবেশন করা হয়েছে। তখন রাত প্রায় ৯টা। ভাত খেতে বসে মুখে দিতেই বড়ো বড়ো কাঁকরের উপস্থিতি টের পাওয়া গেল। দাঁত ভেঙে যাবার মতো শক্ত কাঁকর। কোনোরকম ডালভাত খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে ঘুমাতে গেলাম। গণ বিছানায় মশার উৎপাতে সারারাত তেমন ঘুম হয়নি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যথারীতি গোসল সেরে নাশতার জন্য তৈরি হলাম। একজন ছাত্র নেতা আমাদের বিমানবন্দরে নেওয়ার জন্য আসলেন। আমাদের বললেন তাড়াতাড়ি নাশতা সেরে নিতে। পরোটা এবং সবজি আমাদের সকালের মেন্যু। নাশতা সেরে আমরা যথারীতি কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম।

২১শে জানুয়ারি ১৯৮৩। সকালে সূর্যের আলোটা অনেক বেশি মিষ্টি ছিল। দুপুর সাড়ে বারোটায় বের হয়ে আমরা গাড়িতে উঠলাম। 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দিতে দিতে আমরা কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের দিকে রওনা হলাম। দুপুর ২:৩০ মিনিটের মধ্যে বিমানবন্দরে পৌঁছে আমরা যথারীতি রাস্তার পাশে অবস্থান নিলাম। বিমানবন্দর সড়ক তখন কানায় কানায় পূর্ণ। সারা দেশ থেকে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা বিমানবন্দরে আসতে লাগল। 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে বিমানবন্দর এলাকা মুখরিত হলো। আমাদের অবস্থান ছিল বিমানবন্দর সড়ক দিয়ে বিমানবন্দরে ঢোকার প্রবেশপথ থেকে একটু পশ্চিমে, সড়কের মাঝামাঝি স্থানে। দুপুরের ঝলমলে রোদে দাঁড়িয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানাকে স্বাগত জানানোর জন্য। 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে বিমানবন্দরের পুরো পরিবেশ প্রকম্পিত হলো। অপেক্ষার প্রহর পেরিয়ে অবশেষে একটি গাড়িতে করে শেখ রেহানা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে এলেন। সাথে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা, সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাকসহ সিনিয়র কয়েকজন নেতা ছিলেন। রাস্তার দুই পাশের লাখো জনতার প্রতি হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বিমানবন্দর এলাকা প্রস্থান করলেন। বাংলাদেশের লাখো মানুষের শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় সিক্ত হলেন শেখ রেহানা। বঙ্গবন্ধু কন্যার আগমন যেন সার্থক হলো সেদিন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসার বহু নিদর্শনের মধ্যে এদিনটিও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শেখ রেহানার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচার সরকারের সকল অপতৎপরতা নস্যাৎ হলো। শেখ রেহানাকে অভ্যর্থনা জানানোর পর আমরা যথারীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হল-এ ফিরে আসি। শহর দেখার জন্য ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে ঘুরতে বের হই।

ইতোমধ্যে দলের নেতারা আবার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনের সাথে যোগাযোগ শুরু করলেন। লক্ষ্য একটি-ই আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সাথে সাক্ষাৎ। জানা গেল শেখ সেলিমই একমাত্র ভরসা যিনি নেত্রীকে রাজি করাতে পারবেন। শেখ সেলিমের সাথে মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন। রাত ৮টার দিকে খবর এল সভানেত্রী আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হয়েছেন। খবর শোনার সাথে সাথে সবাই আনন্দে আত্মহারা। নেত্রীর সাথে সাক্ষাৎ। আর একটি স্বপ্ন পূরণের পালা। আমরা সবাই উল্লাসিত। পরেরদিন অর্থাৎ ২২শে জানুয়ারি, ১৯৮৩ সকাল ৯টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে নেত্রী আমাদের সাথে কথা বলবেন বলে জানা গেল।

যথারীতি রাতের খাবার শেষ করে ঘুমাতে যাওয়ার পালা। সে সময় নেতৃবৃন্দ আসলেন। আমাদের পরের দিনের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। হল থেকে সকাল ৮টায় বের হতে সবাইকে জানিয়ে দিলেন। কোনোভাবেই দেরি করা যাবে না। নেত্রী অত্যন্ত ব্যস্ত। বেশি সময় দিতে পারবেন না বলেও জানিয়ে দিলেন। কেউ দেরি করলে মিস করবেন বলে সতর্কও করলেন। নেত্রীর সাথে সাক্ষাতের জন্য সবার আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হলাম।

ঘুম থেকে উঠে সকালের নাশতা সেরে নিলাম। সেই পরোটা এবং সবজি। এরপর সবাই বাসে আসন গ্রহণ করলাম। বিলম্ব না করে রওনা দিলাম ঐতিহাসিক ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের দিকে। এই সেই ৩২ নম্বর বাড়ি যার সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল কর্মসূচি এই ৩২ নম্বরকে ঘিরেই। বাংলার মানচিত্র আমাদের কাছে যেমন ধ্রুব সত্য, ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর বাড়িও তেমনি ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

২২শে জানুয়ারি ১৯৮৩। ভোরের সকাল, শিশির ভেজা ঘাস, ধানমন্ডি ৩২ নম্বর, স্বপ্নের ঠিকানা। সকালের সোনালি রোদটাও যেন মায়াবী আলোর হাতছানি দিচ্ছিল। ঘোষণা এল ৩২ নম্বর বাড়ির আঙিনায় অবস্থান নিতে হবে। সবুজ ঘাসের উপর আমরা সবাই বসে পড়লাম। ছোট্ট একটি মোড়া আনা হলো। নেত্রীর বসার জন্য। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা, এই বুঝি নেত্রী আসছেন। যেই কথা সেই কাজ। অপেক্ষার প্রহর শেষে নেত্রী আসলেন আমাদের মাঝে। শেখ হাসিনার আগমনে সকলে দাঁড়িয়ে 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে ৩২ নম্বর প্রকম্পিত করল। অতি সাধারণ একটি ধূসর রঙের সুতি শাড়ি নেত্রীর পরনে। খুবই সাদাসিধে। হালকাপাতলা গড়ন। নেত্রীকে পেয়ে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় সকলেই যেন নত। নেত্রী ছোটো মোড়াটির উপর বসে পড়লেন। নেত্রীকে চারদিকে ঘিরে আমাদের অবস্থান। শুরুতে মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ সেই সময়ে এক ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে ছাত্রশিবিরের অত্যাচারের মাত্রাও অনেক বেশি ছিল। প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়েছিলাম বটে তবে তা কঠোরভাবে মোকাবিলাও করছিলাম। শুধু টিকে থাকার লড়াই। নেত্রীকে পেয়ে শুরু হলো আমাদের দাবি দাওয়া।

আমাদের পক্ষ থেকে আলাউদ্দিন নাসিম হাত তুলে কিছু বলতে চাইল। নেত্রী তাকে বলতে সুযোগ

দিলেন। আলাউদ্দিন নাসিম বলল, 'আপা ছাত্রশিবিরের অত্যাচারে আমরা ঠিকভাবে রাজনীতি করতে পারছি না। তারা সবসময় আমাদের নেতা কর্মীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে রাখে। রীতিমতো মিটিং মিছিল করতে দিচ্ছে না। আমরা এ বিষয়ে আপনার নির্দেশনা চাই। আমরাও তাদের আগ্রাসী ভূমিকা প্রতিহত করতে প্রস্তুত। প্রয়োজনে আমরাও তাদের প্রতিহত করতে অস্ত্র ধরব'।

একে একে আরো কয়েকজন আমাদের সমস্যাগুলো নেত্রীর সামনে তুলে ধরলেন। অসম্ভব ধৈর্য ও সময় নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা নেত্রী আমাদের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমরা অধীর আগ্রহে নেত্রীর কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। নেত্রী সব কথা শুনে আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন। নেত্রী সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমাদের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব হচ্ছে ভালো করে পড়ালেখা করা। তোমরা ভবিষ্যতে দেশকে নেতৃত্ব দিবে। সে জন্যে তোমাদের নিজেকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখবে, দেশকে নেতৃত্ব দিতে হলে ভালো লেখাপড়া জানতে হবে। তোমাদের ভালো মানুষ হতে হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এক ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সকলকে ধৈর্য ধরতে হবে। দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য তোমাদের তৈরি হতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করতে হবে। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে'।

নেত্রীর উপদেশ শুনে আমরা বিস্মিত হলাম। আমরা ভেবেছিলাম নেত্রী বলবেন ছাত্রশিবিরকে প্রতিহত করতে। নেত্রী বলবেন আঘাত আসলে প্রতিঘাত করতে। নেত্রী আমাদের সে সব কিছুই বললেন না। বললেন মানুষের মতো মানুষ হতে। লেখাপড়া করে বড়ো হতে। দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো নিজেদের যোগ্য করে তুলতে। নেত্রীর উপদেশ শুনে আমরা উদ্দীপ্ত হলাম। উৎসাহিত হলাম। ভাবলাম নেতার যোগ্যতা এটাই হওয়া উচিত। নেতা আপনাকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

দীর্ঘ এক ঘণ্টা আলোচনা শেষে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সেই ঐতিহাসিক ভবনের ভেতরে। নেত্রী আমাদের সকলকে ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক ভবনে রক্ষিত বঙ্গবন্ধু হত্যার সেই সব নিদর্শন দেখাতে লাগলেন। সিঁড়িতে পড়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর রক্তের ছাপ। যা দেখে গায়ের লোম শিউরে উঠে। বিভিন্ন রুমে রক্ষিত বঙ্গবন্ধুর ব্যবহার্য জিনিসপত্র। ছোট্ট শেখ রাসেলকে হত্যার সেই স্থান। বঙ্গমাতার স্মৃতিমাখা রান্নাঘর। দেয়ালে ঘাতকের বুলেটের ক্ষতগুলো। নেত্রী আমাদের সবাইকে ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন। কী বীভৎস ঘটনা। কী মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড। মানবতা কী বিপন্ন। এক হৃদয়বিদারক স্মৃতি। ভাবাই যায় না। আমরা সবাই স্তম্ভিত, বাকরুদ্ধ। পুরো বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে কখন যে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গেল টেরই পেলাম না।

ধানমন্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নম্বরের স্মৃতিধারণ করে আমরা আমাদের যাত্রা শেষ করলাম। এবার বিদায়ের ক্ষণ। আমাদের আবেগ, কোমল মনের অনুভূতি আমাদের আরো শক্তি জোগালো। আমরা আরো দৃঢ় প্রত্যয়ী হলাম। আমরা শপথ নিলাম বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের এগুতে হবে অপশক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ের উদ্দেশ্যে। আমরা জানি না কখন বাংলাদেশে মুক্ত পরিবেশে রাজনীতি করব। আমরা তখনো জানি না কোন অজানায় আমরা ছুটে চলেছি। আমরা তখনো নিশ্চিত নই আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল কোথায় হবে। তবে বঙ্গবন্ধুর আপোশহীন সংগ্রামী জীবন আমাদের পাথেয়। আমরা একবিন্দুও ছাড় দিতে রাজি নই ঘাতকদের। আমরা সকলেই দৃঢ় প্রত্যয়ী। আমাদের শপথ দেশকে স্বৈরাচার মুক্ত করার। আমাদের শপথ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন করার। আমাদের শপথ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার।

অবশেষে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। আমাদের ফিরে যাওয়ার পালা। কিছু অনুভূতি, কিছু স্মৃতি নিয়ে সময় হলো ঘরে ফেরার। মন যেন উদাসীন। দু-দিনের স্মৃতিময় মুহূর্তগুলো আমাদের অন্তরে আজও চির ভাস্বর। আজও মনে বাজে দীপ্ত সে আওয়াজ। সেই চির চেনা স্লোগান, 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' । ■

পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসব

মেজবাউল হক

বছর ঘুরে আবার এসে গেল নতুন বছর, নতুন বছর মানে নতুন ক্লাশ আর নতুন বইয়ের গন্ধ। এই নতুন বই বুকে জড়িয়ে ধরলে অন্যরকম একটি অনুভূতির ছোঁয়া মিলে। স্কুলপ্রেমী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছেই নতুন বই অত্যন্ত আকর্ষণীয়। বছরের প্রথম দিনের বই উৎসব দেখে মুগ্ধ হননি, এমন কেউ আছেন বলে মনে হয় না। আধুনিক সমাজে বই ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করা যায় না। কেননা বই-ই মানুষের মনের দুয়ার খুলে দেয়, জ্ঞান ও বুদ্ধিকে প্রসারিত ও বিকশিত করে, ভেতরে আলো জ্বেলে দেয়। মনুষ্যত্ব অর্জনেরও বড়ো পথ বই পড়া। মূলত মানসিক উৎকর্ষ সাধনে বইপড়ার কোনো বিকল্প নেই।

বই উৎসব বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি উদ্যোগ। প্রতিবছর ১লা জানুয়ারি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে থাকে। এটি পাঠ্যপুস্তক উৎসব বা পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস নামেও পরিচিত।

এ বছর প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থীদের হাতে ৩৫ কোটি বই তুলে দেওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে বই বিতরণের বিশাল এক কর্মযজ্ঞ। শুধু দেশে নয়, বিদেশের বাঙালি পাড়ার স্কুলগুলোতেও বই বিতরণ করা হয়। পরিবহন খরচও বহন করে সরকার। তাই এ আনন্দ এখন সবার।

এনসিটিবি চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা বলেন, ২০২০ শিক্ষাবর্ষে ৩৫ কোটি ৩৯ লাখ ৯৪ হাজার ১৯৭টি বই বিতরণ করা হয়। এবার মোট ৪ কোটি ২৭ লাখ ৫২ হাজার ১৯৮ জন শিক্ষার্থীকে নতুন বই দেওয়া হয় বিনামূল্যে।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি নতুন বছরের প্রথম দিন সাভারের অধরচন্দ্র সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বই উৎসবে যোগ দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিনামূল্যের বই বিতরণ করেছেন। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে বই বিতরণ করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন। ■

শিশুতোষ গল্প

খুদে পাঠক, খুদে লেখক

ওবায়দুল মুন্সী

কাব্য ক্লাস ফাইভে পড়ে।

ক্লাস শেষে প্রতিদিন কিছু সময় গ্রন্থাগারে, কিছু সময় বইপাঠে কাটায়; এটা তার নিয়মিত রুটিন। বিকেলবেলা বাড়ির বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করে, সন্ধ্যা হওয়ার আগেই ঘরে ফিরে আসে। ক্লাসের পড়া শেষে ৯.৩০ মিনিটে রাতের খাবার খায় তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরে ঘুম থেকে ওঠে।। হাত-মুখ ধুয়ে আবার কিছু সময় পড়াশোনায় মনযোগী হয়। গোসল করে নাশতা সেরে আবার স্কুলে চলে যায়।

গ্রামীণ পরিবেশে বড়ো হলেও কাব্যর ভিতরে পরিচ্ছন্নতা রয়েছে। সে সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে। হাওরাঞ্চলের অজোপাড়া গাঁয়ের এই শিশুটি অন্য সব শিশুদের থেকে একটু আলাদা বটে! ক্লাসের ফার্স্ট বয় সে। খেলাধুলা, গান গাওয়া এবং কবিতা পাঠেও সবসময় প্রথম স্থান লাভ করে।

স্কুলের নিজস্ব লাইব্রেরিতে বসে শিশুতোষ গল্প, ছড়া-কবিতার বই পড়ে। পড়তে পড়তে প্রায়ই চিন্তা করত যে এসব যারা লিখেছেন, তাঁরা তো আমার মতোই মানুষ! তাহলে আমি পারি না কেন? সেই থেকে সে কী যেন ভাবে! আর হারিয়ে যায় ভাবনার ইন্দ্রজালে।

একদিন তার স্কুলের ম্যাডাম মুক্তা খানম ক্লাসে পড়াতে এসে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন–ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ আমি ছড়ার বই বের করছি, তোমাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে বই তুলে দেবো। বই পাঠ করে সবাইকে একটা করে ছড়া বলতে হবে, কি পারবে না? সবাই বলল– জি ম্যাডাম পারব।

ক্লাস ছুটির পরে কাব্য মুক্তা ম্যাডামের কাছে গিয়ে সাহস করে বলল– ম্যাম, যদি আপনার বইয়ে আমি একটা ছড়া দিতে চাই সেটা ছাপাবেন? ম্যাডাম কাব্যের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– কেন ছাপাব না?

কাব্য খুশি হয়ে বলল, শুক্রবার যেহেতু ছুটি আছে তাহলে শনিবার লিখে দিচ্ছি ম্যডাম। ম্যাডাম খুশি হয়ে বললেন– ঠিক আছে।

সেদিন সবাই চলে গেলেও কাব্য লাইব্রেরিতে রয়ে যায়। কয়েকজন বিখ্যাত কবিদের ছড়ার বই পড়তে থাকে।

আর ভাবতে থাকে কাব্য কী লিখবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করেই মাথায় এসে যায় একটা কিছু! কাব্য লিখে নেয় খাতার পাতায় এভাবে –

ইচ্ছে করে
কাব্য শুভ

ইচ্ছে করে, স্বপ্ন দেখি
হোক না সাদা-কালো!
চারিদিকে স্বপ্ন দিয়ে
ভরে দিতে আলো।

ইচ্ছে করে, ডানা মেলে
ওই আকাশে উড়ি
ছন্দ-সুতোয় বানাই নাটাই
নানান জাতের ঘুড়ি!

ইচ্ছে করে, হতাম যদি
ফুল-পাখিদের মতো
সুবাস-গানে ডেকে যেতাম
আছে মানুষ যতো!

ইচ্ছে করে, ইচ্ছেগুলো
নিত্য পূরণ করি
ইচ্ছেমতো ইচ্ছে যত
আপন করে ধরি।

শনিবার সকালে ম্যাডামকে যখন নিয়ে দেখালো, তিনি তো অবাক। এতটুকু শিশু এভাবে লিখতে পারে? তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। তবুও আরেকবার বললেন – সত্যি করে বলো তো! এটা তুমি লিখেছ?

কাব্য- জি ম্যাম, সত্যিই এটা আমি লিখেছি। ম্যাম আনন্দে তাকে কোলে নিয়ে বললেন– তুমিই পারবে, বাবা। তুমি কী আর এমনি এমনি লাইব্রেরিতে সময় কাটাও। এই বয়সে যে এত ভালো লিখেছ, সেই যুগের বিখ্যাত লেখকরাও পেরেছেন কি-না, আমার জানা নেই! কাব্য,ম্যাডামের উৎসাহ পেয়ে খুশি মনে ক্লাসে ঢুকে গেল।

ফেব্রুয়ারি মাসের একুশ তারিখ কাব্যর স্কুল লাইব্রেরির আয়োজিত বইপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা শিক্ষা অফিসার এসেছেন। উপস্থাপনা করছেন স্কুলের ম্যাডাম মুক্তা খানম।

মুক্তা খানম, মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলতে থাকেন-

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশের মানুষের গৌরবোজ্জ্বল একটি দিন। এটি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও সুপরিচিত। বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯৫২ সালের এই দিনে (৮ই ফাল্গুন, ১৩৫৮) বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন তরুণ শহিদ হন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো রফিক,জব্বার,শফিউল,সালাম,বরকতসহ অনেকেই। তাই এ দিনটি শহিদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় জেলা শিক্ষা অফিসার শেখ এ কে এম জাকারিয়া স্যার। স্যারের বক্তব্যের পরেই আমরা বিজয়ী বন্ধুদের হাতে মাননীয় স্যারের মাধ্যমে পুরস্কার তুলে দেবো। প্রধান অতিথির বক্তব্যের শেষে আবারো মাইক্রোফোন হাতে ম্যাডাম বললেন–এবার কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাচ্ছি পুরস্কার ঘোষণায়। ৩য়, ২য় পুরস্কার নেওয়ার পরে, ম্যাডাম বললেন– এবার প্রথম পুরস্কার ঘোষণার আগে, আমাদের প্রধান অতিথি মাননীয় স্যারকে অবহিত করতে চাই, আজকের বইপাঠ প্রতিযোগিতায় যে শিশুটি প্রথম হয়েছে সে শুধু আমাদের লাইব্রেরির খুদে পাঠকই নয়! একজন খুদে লেখকও! স্যারের হাতে আমার একটি ছড়ার বই আছে, উক্ত বইয়ের বিশেষ পাতার প্রথম ছড়াটি আজকের প্রথম বিজয়ী কাব্য শুভর লেখা। তাই এই খুদে লেখক, খুদে পাঠকের কাছে পুরস্কার তুলে দিবেন আমাদের মাননীয় শিক্ষা অফিসার স্যার।

কাব্য যখন পুরস্কার নিতে আসে তার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার পর, শিক্ষা অফিসার খুশি হয়ে নগদ এক হাজার টাকা উপহার দেন এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেন।

বন্ধুরা, তোমরাও যদি কাব্যর মতো হতে চাও তাহলে লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কুল লাইব্রেরিতে গিয়ে গল্প, ছড়া, কবিতা, সায়েন্সফিকশন বইও পড়তে হবে। দেশের প্রত্যেক জেলার সরকারি গণগ্রন্থাগারে সরকার তোমাদের উপযোগী অনেক বই রেখেছেন। এসব বই সদস্য হয়ে বাড়িতে এনেও সবাই পড়তে পারো। ■

গল্প

সততা স্টোর

জুবাইর জসীম

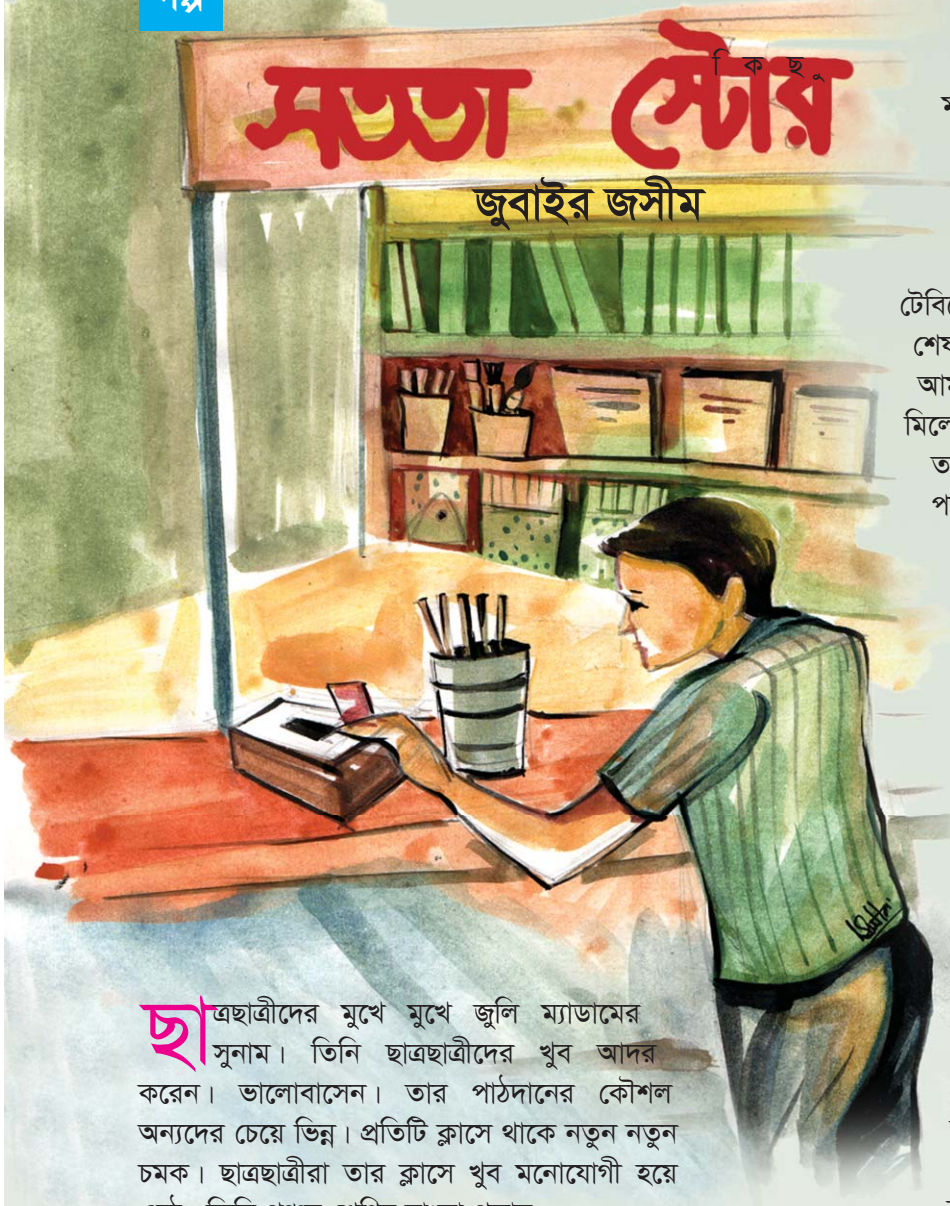

ছাত্রছাত্রীদের মুখে মুখে জুলি ম্যাডামের সুনাম। তিনি ছাত্রছাত্রীদের খুব আদর করেন। ভালোবাসেন। তার পাঠদানের কৌশল অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। প্রতিটি ক্লাসে থাকে নতুন নতুন চমক। ছাত্রছাত্রীরা তার ক্লাসে খুব মনোযোগী হয়ে ওঠে। তিনি পঞ্চম শ্রেণির বাংলা পড়ান।

সেদিন পাঠদানের সময় হঠাৎ এক নতুন আইডিয়ার কথা জানালেন তিনি। এতে শিক্ষার্থীরা কৌতূহলী হয়ে উঠল। তিনি সরাসরি আইডিয়ার কথা বললেন না। একটি প্রশ্ন করলেন। বলো তো, আমার মাথায় কোন আইডিয়া ঘুরপাক খাচ্ছে?

যে সঠিকভাবে বলতে পারবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। এসময় তুহিন হাত তুলে কিছু বলার জন্য অনুমতি চাইল। জুলি ম্যাডাম বললেন, তুহিন তুমি বলতে চাও? তুহিন বলল, জি ম্যাডাম। ম্যাডাম তাকে বলার অনুমতি দিলেন। তুহিন বলল, আপনার আইডিয়াটা একটা কাগজে লিখুন। সেটি ভাঁজ করে টেবিলে রেখে দিন। আমাদের বলা শেষ হলে এটি খুলে দেখব। সেটা আমাদের কার উত্তরের সাথে মিলেছে। সেই পাবে পুরস্কার। তখন কেউ মন খারাপ করতে পারবে না। ম্যাডাম বললেন, তোমার আইডিয়া গ্রহণ করা হলো। আর ম্যাডাম তাই করলেন।

ম্যাডাম বললেন, যারা লিখতে চাও চকবোর্ডে লিখ। তুহিন লিখল ফুলের বাগান। জাইমা লিখল বৃক্ষরোপণ। সাদিব লিখল ক্রিকেট খেলা। মারসাদ লিখল পিকনিক। এভাবে দশ-বারোজন তাদের আইডিয়ার কথা লিখল।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবার তুহিনকে কাছে ডাকলেন। ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটি খুলতে বললেন তাকে। সে ম্যাডামের কথামতো ভাঁজ করা কাগজটি খুলল। সবার কৌতূহল বেড়ে যায়। কারটা মিলবে? কে পুরস্কার পাবে? তুহিন উচ্চস্বরে পড়ল– সততা স্টোর। সবাই চুপ করে রইল। কেউ কোনো কথা বলল না।

ম্যাডাম বুঝতে পারলেন কেন তারা চুপ আছে। কারণ সততা স্টোর সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। তখন তিনি বিষয়টা বুঝিয়ে দিলেন। ছাত্রছাত্রীরা

বিষয়টি বুঝতে পেরে খুব খুশি হলো। সততা স্টোর থেকে তারা সুলভে জিনিস কিনতে পারবে।

জুলি ম্যাডাম ক্লাস শেষ হলে ছাত্রছাত্রীদের বলেন, এসো দেখাই। তিনি 'সততা স্টোর' লেখা স্কুল করিডোরের নতুন কক্ষটির তালা খুললেন। সবাই তো অবাক নতুন শো-কেসে থরে থরে সাজানো নানা সামগ্রী।

খাতা, কলম, পেনসিল, রাবার, ছবি আঁকার বই, ড্রয়িং খাতা, গল্প-কবিতার বই, স্কেল ইত্যাদি দিয়ে সাজানো। পাশে রয়েছে মূল্য তালিকা। দাম রাখার বাক্স। কোনো বিক্রেতা নেই। পছন্দের জিনিস নিজেরাই কিনবে। কিনে ওই বাক্সে টাকা জমা দিতে হবে। জুলি ম্যাডাম বিস্তারিত বুঝিয়ে বলেন।

তিনি ছাত্রছাত্রীদের মন মানসিকতার গুণগত পরিবর্তন চান। এতে সততা ও বিবেকের পরীক্ষা হবে।

সততা চর্চার একটি সুন্দর মাধ্যম। বিক্রেতা ছাড়া সততা স্টোর ভালোই চলছে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের পছন্দের জিনিস কিনে। তারা বাড়ি গিয়ে সততা স্টোরের গল্প করে। ম্যাডামের সুনাম করে।

বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। ওই অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ মাকে পুরস্কৃত করা হবে। সবার মাকেই স্কুলে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

টিফিনের বিরতিতে সবাই বিদ্যালয় পরিষ্কার করতে লাগল। একেক জনকে একেকটা দায়িত্ব দিয়ে কাজ ভাগ করে দেওয়া হলো। মেহেদীর দায়িত্ব পড়ে আরও সুন্দর করে সততা স্টোর সাজানোর। মেহেদী এই ফাঁকে সততা স্টোর থেকে একটি বই লুকিয়ে নিল। রাতে মেহেদী সেই বইটি পড়তে লাগল।

মা দেখে বললেন, তুমি এই বই কোথায় পেলে? মেহেদীর মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। মা কিন্তু সব বুঝে গেছেন। তবুও কিছু না বলে কাছে টেনে নিলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, কাল তোমাদের স্কুলে শ্রেষ্ঠ মাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। এভাবে মূল্য না দিয়ে কারো জিনিস নেওয়া ভালো নয়। এ কাজ আর কোনোদিন করবে না। কালকে বইটি ফেরত দিয়ে আসবে। তোমাদের জুলি ম্যাডাম সততা স্টোরের মাধ্যমে তোমাদের সৎ পথে চলা ও সত্যবাদী হওয়ার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তুমি এমন কাজ করলে আমি শ্রেষ্ঠ মা হব কী করে? মেহেদী সব শুনে অনুতপ্ত হলো। সে পরদিন অনুষ্ঠানের আগে জুলি ম্যাডামের হাতে বইটি দিয়ে সব কথা খুলে বলল। বলেই সে কেঁদে ফেলল। জুলি ম্যাডাম মৃদু হেসে বললেন, তুমি শুদ্ধ হয়েছ। আমরা তো এমনটাই চাই। মা শুদ্ধ হলে সন্তান শুদ্ধ হবেই। এরপর মাইকে ঘোষণা করা হলো শ্রেষ্ঠ মায়ের নাম। ফাতেমা বেগম। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র মেহেদী হাসানের আদর্শ মা। মাইকে ঘোষণা শুনে মেহেদীর আনন্দ আর ধরে না। সে পণ করল, মায়ের আদর্শ সে সারাজীবন মেনে চলবে। ■

জন্মভূমি

লুৎফর রহমান রবি

আমার দেশের মাটি, ও ভাই!
সোনার চেয়ে খাঁটি,
সবুজ-শ্যামল আচ্ছাদনে
দারুণ পরিপাটি।

সকালবেলায় ডাকে পাখি
ঘুম ভাঙাবে বলে,
পদ্মা, মেঘনা, কর্ণফুলি
এঁকে বেঁকে চলে।

হাটে,মাঠে,রাস্তাঘাটে
নানান ফুলের মেলা,
মন আনন্দে এই দেশে তাই
ভ্রমর করে খেলা।

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে না তো তুমি,
সবুজ-শ্যামল ছায়ায় ঘেরা
আমার জন্মভূমি।

গল্প

মেঘকন্যা আর বাচ্চা ভূত

খায়রুল আলম রাজু

লুইজা, নাদুসনুদুস বাচ্চা ভূত। ভারি মিষ্টি। দুদিন হলো উড়তে শিখেছে। এ গাছে-ওগাছে, এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কখনো নদীতে, সবুজ মাঠে কিংবা ঝিলের পাড়ে। উড়ে উড়ে নাচে। গান করে। শুধু কি তাই, লুইজা পড়াশোনাও করে।

ওর স্কুল হলো বটগাছটায়। ওখানেই ওর বাড়ি। সকালে পড়ে। বিকেলে খেলে। সন্ধ্যায় অঙ্ক কষে। ভুলেও দুষ্টুমি করে না। ঝগড়াঝাঁটি করে না।

মায়ের কথা শুনে। ঠিকঠাক খাবার খায়। পড়ার সময় পড়ে। খেলার সময় খেলে। এজন্য সব্বাই ওকে আদর করে। কপালে চুমু দেয়। লুইজা তখন হাসে। লজ্জায় লাল হয়ে যায়। একদিন লুইজা উড়ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। ও দেখল আকাশে পাখি উড়ে। রকেটে মানুষ চাঁদে যায়। রাতে আকাশে তারা জ্বলে। চাঁদ ওঠে। সোনালি আলো ছড়ায়। কী দারুণ দৃশ্য! পটে আঁকা ছবির মতো। লুইজা তখন ছড়া লিখে...

আকাশ জুড়ে খুশির মেলা
তারার মেলা রাতে!
চাঁদনী রাতে আলোর মেলা
জোনাক জ্বলে সাথে।

সেই থেকে শুরু, আকাশ নিয়ে ওর ভাবনা। আকাশ কেন নীল? কেন সূর্য ওঠে। ডুবে। তুলোর মতো মেঘ ওড়ে। ইত্যাদি, ইত্যাদি...

একদিন লুইজা পড়ছিল। তখন সকাল। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। টাপুর-টুপুর শব্দ। যেন কেউ নূপুর পরে নাচছে। লুইজা বটগাছটার নিচে এল। শব্দের আওয়াজ শোনে এদিক-সেদিক খুঁজল। হঠাৎ সে সবুজ ঘাসে কাউকে দেখল। পুরো শরীর মেঘে ঢাকা। হাত-পা ধবধবে সাদা। টুকরো টুকরো মেঘের মতো। চুলগুলো সাত রঙের রংধনু। এলোমেলো। উসকোখুসকো। লুইজাকে দেখেই মেয়েটি ডানা মেললো। আকাশ পানে। লুইজা পিছু ছুটলো। ডানা উড়িয়ে। ছুটতে, ছুটতে লুইজা পথ হারিয়ে ফেলল। সবকিছুই অচেনা লাগে! এখানকার সব কিছু অন্য রকম। ভিন্ন। পৃথিবী থেকে আলাদা। পুরো দেশটাই ধবধবে সাদা। আকাশটাও। গাছ,মাটি, ফুল, ফল সবকিছুই সাদা। তুলতুলে নরম। লুইজার ভয় ভয় করছিল! ভয়ে সে কান্না শুরু করল। হঠাৎ মেঘের গাড়ি চড়ে একটি লোক এল। লোকটিও ধবধবে সাদা। টুকরো টুকরো মেঘের মতো। মাথায় বরফের মুকুট।

লুইজা বলল, আপনি কে?

লোকটি বলল, আমি মেঘরাজা।

আর এটা আমার রাজ্য।

লুইজা মিষ্টি করে বলল, 'এটাই বুঝি মেঘ রাজ্য?'

হ্যাঁ,এটাই মেঘ রাজ্য! কিন্তু তুমি এলে কী করে? তুমি তো ভূত ছানা। বাচ্চা ভূত। অনেক ছোটো। একা এলে কী করে?

আমি ছোট্ট একটি মেয়ের পিছু পিছু এখানে এসেছি। উড়ে উড়ে। আমি ওই পৃথিবীতে থাকি।

ওহ, বুঝেছি, তুমি আমার মেঘকন্যা টুটুই এর সাথে এসেছ। সে বৃষ্টি হয়ে প্রায়ই পৃথিবীতে ঘুরতে যায়। পৃথিবীর নদী, সবুজ সবুজ ঘাস,কাশফুল ওর খুব প্রিয়।

ওই যে দেখো, টুটুই আসছে। ও ভারি দুষ্ট। পড়াশোনা করে না। সারাক্ষণ দুষ্টুমি করে।

টুটুই এসে লুইজাকে বলল, কে তুমি? নাম কী তোমার?

আমার নাম লুইজা। আমি পৃথিবী থেকে এসেছি। আমি কি তোমার বন্ধু হতে পারি?

অবশ্যই, কেন নয়? মেঘরাজা বলল ভূত সোনা, টুটুই ও তুমি আজ থেকে বন্ধু। ভালো বন্ধু। কিন্তু টুটুই তো ভারি দুষ্ট। পড়াশোনা করে না! দুষ্টমি করে কী টুটুই লজ্জা পেল। সে বলল, দুষ্টুরা সব পারে। পড়াশোনা করতে হয় না।

লুইজা তো চিন্তায় পড়ল! পড়াশোনা ছাড়া কী করে সব কিছু পারা যায়! টুটুই এসো তবে আজ পরীক্ষা হোক।

মেঘরাজা বলল কী করে পরীক্ষা হবে?

লুইজা বলল, আমি টুটুইকে একটি প্রশ্ন করব, সেও আমাকে প্রশ্ন করবে। যে পারবে সে জয়ী। যে পারবে না সে পরাজিত।

বাহ! সুন্দর তো। তাই হোক। টুটুই বলল, আমি আগে প্রশ্ন করব। বলো তো লুইজা,আকাশ নীল কেন?

লুইজা বলল, 'আকাশ হলো গ্যাস ভর্তি ফাঁকা জায়গা। আকাশে বিভিন্ন গ্যাস ভর্তি থাকায় আকাশ নীল।'

মেঘ রাজার উত্তর, ঠিক বলেছ লুইজা। এবার তোমার প্রশ্ন করো। লুইজা বলল, টুটুই বলো তো ২০ থেকে -২১ বাদ দিলে কত হয়?

টুটুই চিন্তায় পড়ল। ২০ থেকে -২১ বিয়োগ হয় নাকি! উত্তর মিলে না!

লুইজা বলল, শুনো টুটুই, এটা হলো বীজগাণিতিক সংখ্যা। এতে ২০ হলো ধনাত্মক সংখ্যা আর -২১ হলো ঋণাত্মক। তাই -২১ বড়ো হওয়ায় ২০ থেকে ২১ বিয়োগ করলে উত্তর হবে -১।

মেঘরাজা বলল, দেখলে টুটুই, দুষ্টুরা সব পারে না। তাই পড়াশোনা করা জরুরি। পড়াশোনা ছাড়া কেউ-ই বড়ো হয় না। জীবনে বড়ো হতে হলে, পড়তে হবে, শিখতে হবে, জানতে হবে। টুটুই এবারও লজ্জা পেলো।

সে বলল, বাবা, বাবা আজ থেকে আর দুষ্টুমি করবো না। পড়াশোনা করব। লুইজা সত্যিই আমার বন্ধু। ভালো বন্ধু। এই নাও লুইজা তোমার পুরস্কার। বরফের মুকুট। তোমাকে অভিনন্দন। ■

নতুন বছর

নাসির উদ্দিন

পুরাতনকে বিদায় নিয়ে আসে নতুন বছর,
স্মৃতির পাতায় জন্ম দিয়ে হাসিকান্নার লহর।
নতুন সাজে পুব আকাশে উঠে রঙিন রবি,
পেছনে তার ঢেকে রেখে হারানো বেশ ছবি।
সম্মুখপানে প্রকাশ করে মিষ্টি- মধুর হাসি,
আশার আলো দেখে যাতে গোটা বিশ্ববাসী।
জরাজীর্ণ মুছে দিয়ে সাজতে নতুন সাজে,
নব বীজের জন্ম দেয় সে এ ধরণির মাঝে।
হতাশাকে মুছে দিয়ে দেখতে আশার স্বপন,
মানব মনে সতেজ বীজের করে আবার বপন।
হাসিকান্না মিলেই জীবন যদিও বিধির রীতি,
তবু জ্বলুক হাসির প্রদ্বীপ কেটে সকল ভীতি।
অতীতের সব দুঃখকষ্ট আর না স্মরণ করে,
এসো সবাই সুখের বাতি জ্বালাই ঘরে ঘরে।
করছি আশা আগত দিন কাটবে সবার সুখে,
অপরিসীম হাসির রেখা ফুটবে সবার মুখে।

আলোর পথে

বাতেন বাহার

একটি শিশু রৌদ্রে পুড়ে উড়ায় শুধু ঘুড়ি
ভাতের থালা সরিয়ে রেখে, খায় পিয়াজি মুড়ি।
তার জন্য মা ও বাবার নেই ভাবনার শেষ
কেমন করে করবে তাকে সুবোধ অবশেষ?

আরেক শিশু পড়তে না তো আঁকতে বাসে ভালো
তাকে নিয়েও চিন্তা করে মুখটি বাবার কালো।
একদিন মা রংতুলি ও কিনে রঙিন ঘুড়ি
বলল-খোকা, আয়রে তোরা-আয় স্বপনে উড়ি।

উড়িয়ে ঘুড়ি যে খাস্ মুড়ি মন দিয়ে তুই শোন
তোর ঘুড়িতে আঁকবে ছবি তোরই ছোটো বোন।
বোনের সাথে ভাই আঁক্‌বে মজার ছবি শত
সেই খুশিতে ঘুড়িও ঠিক উড়বে মনের মতো।

যার বুকেতে বাঘের ছবি- বাঘ ঘুড়ি তার নাম
সাপ থাকলে সাপ ঘুড়ি সে- অনেক বেশি দাম।
থাকলে পাখি ময়না টিয়ে উড়বে রে পতপত
ছিঁড়লে সুতো দূর আকাশে খুঁজবে পরীর রথ।

উড়িয়ে ঘুড়ি-সন্ধ্যে বেলা ভাই ভগ্নি নিয়ে
ঘুড়ির বুকে আঁকবি ছবি রং ও তুলি দিয়ে।
লাল-সবুজে মা'র পতাকা, আঁকবি ছবি মা'র
আঁকবি অ আ... এ নাম ধরে ডাকবি বারংবার।

ইংরেজিতে আঁকবি আরো এ বি সি ডি আর
দেখবে সবে ঘুড়ির বুকে নিখুঁত ছবি কার।
ঘুড়িতে যার নিখুঁত ছবি রঙের কারুকাজ
বাসবে ভালো সবাই তাকে পরিয়ে জয়ের তাজ।

মায়ের কথা শেষ না হতে- বলল দু'ভাই মিলে
নিখুঁত ছবি এঁকেই তারা উড়বে আকাশ নীলে।
ভাষার ছবি আশার ছবি আঁকবে রীতিমতো
আলোর পথে হাঁটবে তারা আসুক বাধা যত।

ঘর

আমীরুল ইসলাম

পার্কের পাশে থাকি আমরা
আট তলাতে ঘর
সবুজ পার্ক দেখে ভাবি
এটাই তেপান্তর।

সবুজ সবুজ অবুঝ যত
গাছপালাদের ভিড়
পার্কে থাকি আমরা
নই মোটে অস্থির।

বিকেল বেলা খেলতে যাই
গাছেরা কথা কয়।
সবুজ পাতায় জীবন নাচে
কিসের আবার ভয়।

আট তলাতে থাকি আমরা
আকাশটাকে ছুঁই
গাছ আমাদের বন্ধু আমরা
গাছের পাশে শুই।

পার্ক মানে তো পাখপাখালি
গাছগাছালির ঘর।
আমার কাছে পার্ক মানে তো
ঘরের তেপান্তর।

দীপ্ত আলোর মুখ

দেলওয়ার বিন রশিদ

মুজিব আমার মুক্ত জীবন
দীপ্ত আলোর মুখ,
মুজিব আমার শক্তি সাহস
যুদ্ধ জয়ের সুখ।

মুজিব আমার সবুজ স্বদেশ
স্বপ্ন আশার রথ,
মুজিব আমার মেধা মনন
সামনের চলার পথ।

মুজিব আমার গল্প কথা
নতুন বই পড়া,
মুজিব আমার সুখ ছন্দ
স্বাধীনতার ছড়া।

মুজিব আমার বিজয় গাঁথা
জয়, বাংলা জয়,
মুজিব আমার জাতির পিতা
বাংলাদেশের হৃদয়।

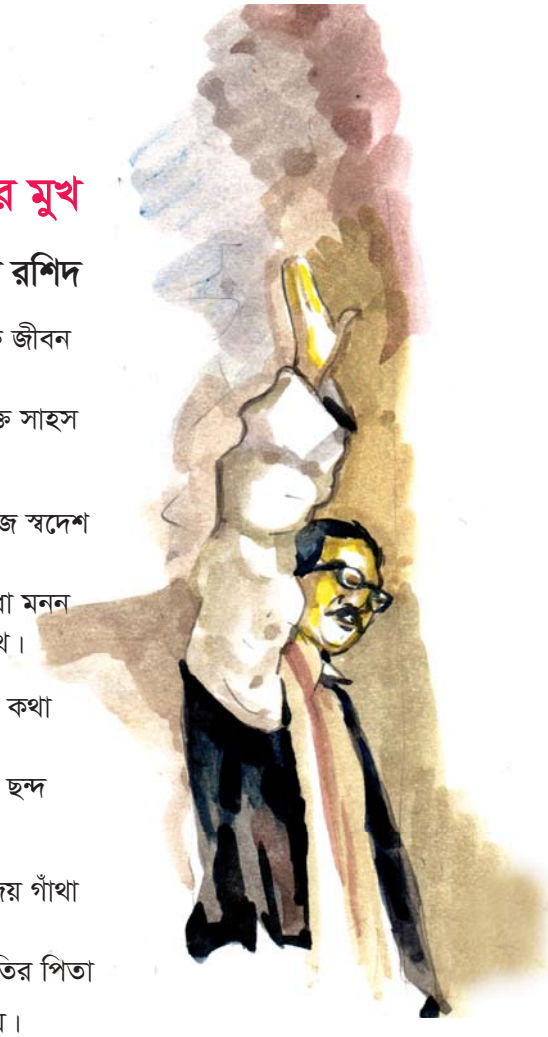

হে বীর যোদ্ধা!

শেখ সালাহ্উদ্দীন

তোমরা এনেছ মুক্ত স্বদেশ
নতুন আলোর দিন
সীমাহীন আশা হৃদয়ে হৃদয়ে
জীবন ভাবনাহীন।

শত্রুর থেকে এনেছ ছিনিয়ে
অম্লান এ পতাকা
কোটি বাঙালির বক্ষে লালিত
স্বপ্নের রঙে আঁকা।

তোমাদের ত্যাগে বাংলা মায়ের
দুঃখ হয়েছে দূর
শেকল ভাঙার গানে এ জীবনে
এনেছ নতুন সুর।

ইতিহাসে লেখা থাক বা না থাক
তোমাদের ওই নাম
হে বীর যোদ্ধা! কোটি বাঙালির
গ্রহণ করো সালাম।

ইচ্ছে করে

কাজী নাদিয়া তাসনিম প্রিয়ন্তি

ইচ্ছে করে ফুলের মতো
মিষ্টি সুবাস ছড়াতে,
ইচ্ছে করে নীল আকাশে
মেঘের ভেলা ভাসতে।
ইচ্ছে করে পাখি হয়ে
উড়ে বেড়াই সব খানে,
সুরে সুরে সব মানুষে
মুগ্ধ হবে আমার গানে।
ইচ্ছে করে হতাম যদি
প্রজাপতির মতো,
রঙিন করে দিতাম সবই
মলিন আছে যত।

দ্বিতীয় শ্রেণি, মডেল একাডেমী, কল্যাণপুর, ঢাকা

ডিমের খবর

শরীফ আব্দুল হাই

খবর এল খবর
ও পাড়ায় এক পাতি শেয়াল
ডিম পেড়েছে জবর।
ডিমটা নাকি নড়েচড়ে
দাঁড়ায় এবং হাঁটে
তেষ্টা পেলেই পানি খেতে
যায় সে নদীর ঘাটে।
পানি খেয়ে পেটটা নাকি
হয়েছে এক ঢোল
ঢোল বাজাতে পাড়ার লোকে
বাঁধায় গণ্ডগোল।
এই কথাটা পাড়ায় পাড়ায়
ছড়িয়ে যখন গেল
ছেলে বুড়ো হাজার মানুষ
দেখতে তাকে এল।
ডিমটা কোথায়? ডিমটা কোথায়?
ডিমের খবর কই?
সত্যি শেয়াল ডিম পেড়েছে?
না দেখে হইচই।

এক যে ছিল ইনশা বুড়ি

ডা. আয়েশা আক্তার

এক যে ছিল ইনশা বুড়ি,
কথায় যে তার নেইকো জুড়ি।
হ্যালো হ্যালো- আম্মু কোথায় –
তাড়াতাড়ি এসো বাসায়।
পড়ালেখা শেষ করেছি
খেলব এখন তোমার সাথে।
ডাক্তার তুমি- রোগীর সেবায়!
ঠিক আছে মা, থাকো সেথায়।
খেলব আমি দাদুর সাথে
তিনিই এখন আমার সাথি।
দাদু শুধুই খাবার হাতে
যখন তখন বলেন খেতে,
কলিং বেলের শব্দ হলো,
আব্বুটা যে কোথায় গেল–
দেখি আমি দরজা খুলে
জড়িয়ে ধরি আম্মু বলে।

মানুষ হওয়ার চাবি

আজমেরী সুলতানা

সকাল বেলায় ইশকুলে যাও
রাতের বেলায় পড়।
বিকাল বেলা খেলা কিসের?
বসে বসে অঙ্ক কর।
তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো
উঠবে ভোরের বেলা,
নাস্তা করেই পড়তে বসো
পড়া আছে যে ম্যালা।
গুলতি, লাটিম সবই আছে,
করব কখন খেলা?
লেখাপড়া করেই যদি
কাটিয়ে দেই বেলা।
একা একা বসে তাই
মনে মনে ভাবি,
খেলাধুলাই হতো যদি
মানুষ হওয়ার চাবি।

নিবন্ধ

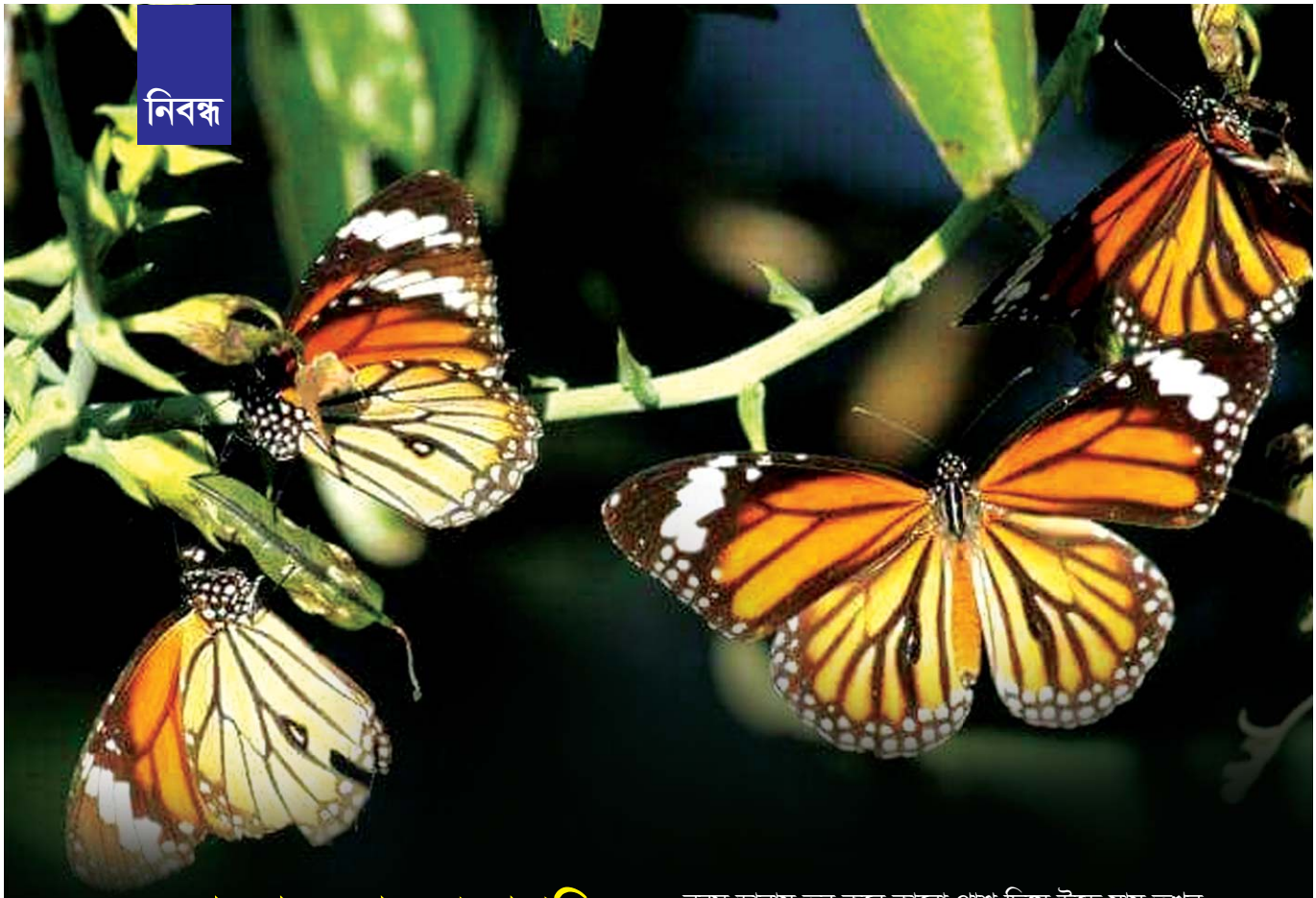

বাংলাদেশের প্রজাপতি

ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

প্রজাপতির (Butterfly) মতো এত সুন্দর পতঙ্গ কি পৃথিবীতে আর আছে?

কী ছোট্ট বন্ধুরা, বলো আছে কি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

নেই। অন্তত আমার জানামতে নেই। তবে যদি থেকেও থাকে তাহলে তার সংখ্যা অতি নগণ্য।

আসলে কল্পনার তুলিতে যত রং আঁকা যায়, তত রঙেরই প্রজাপতি থাকা সম্ভব। বাহারি কারুকাজ যুক্ত রঙিন ডানার প্রজাপতিগুলোকে পৃথিবীর সবখানেই দেখা যায়। ছোট্ট বর্ণিল নিরীহ এই পতঙ্গগুলোকে দেখলে নিশ্চয়ই তোমাদের আদর করতে ইচ্ছে করে?

কি, করে না?

অবশ্যই করে! রঙিন এই প্রজাপতিগুলো যখন ওদের নরম ডানায় ভর করে কারো পাশ দিয়ে উড়ে যায় তখন তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে না তাকিয়ে কি থাকা যায়?

যায় না ছোট্ট বন্ধুরা!

তোমরা হয়ত জানো না প্রজাপতিকে সাধারণত পরিবর্তন, আনন্দ, ভালোবাসা ও রূপান্তরের প্রতীক বলা হয়ে থাকে। তবে প্রজাপতি শুধু সুন্দরের প্রতীকই নয়, প্রকৃতি সুস্থ কিনা সেটিও প্রজাপতির সংখ্যা ও অবস্থার মাধ্যমে জানা যায়।

সূত্রমতে, পৃথিবীতে ১৫–২০ হাজার প্রজাতির প্রজাপতি রয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা বাংলাদেশে ৫০০–৫৫০টি প্রজাতির প্রজাপতি থাকতে পারে। বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী বর্তমানে এদেশে প্রায় ৪০০ প্রজাতির প্রজাপতি শনাক্ত করা গেছে। কিছুদিন পর পরই নতুন নতুন প্রজাতি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শনাক্ত করা হচ্ছে। আর তাই প্রজাতির সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা কি জানো যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রজাপতির পার্ক রয়েছে? আমাদের দেশেও কিন্তু এরকম প্রজাপতি পার্ক আছে।

বলতে পারবে আমাদের দেশে এরকম ক'টি পার্ক আছে? কি পারছ না? বলে দেব?

এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে প্রজাপতির পার্কের সংখ্যা তিনটি। প্রথমটি চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়, দ্বিতীয়টি গাজিপুরের ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে ও তৃতীয়টি গাজীপুরের বাঘের বাজারে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাফারি পার্কের ভেতর।

তবে জেনে রেখো, এদেশে প্রজাপতি পার্ক ছাড়াও কিছু কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে প্রাকৃতিকভাবে প্রচুর সংখ্যায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রজাপতির দেখা মেলে। সেসব এলাকার কয়েকটির নাম আমি তোমাদের বলছি। যেমন– লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার), সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান (চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ), কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান (কাপ্তাই, রাঙামাটি), মধুপুর জাতীয় উদ্যান (মধুপুর, টাঙ্গাইল), ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান (গাজীপুর), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস (সাভার, ঢাকা) ইত্যাদি।

প্রজাপতি কোন বর্গের (Order) প্রাণী বলতে পারবে? কী মাথা চুলকাচ্ছ কেন? এরা হলো লেপিডপটেরা (Lepidoptera) বর্গের প্রাণী। প্রজাপতি ছাড়া এই বর্গে আরো রয়েছে মথ (Moth)। আর সেকারণেই মথ প্রজাপতির নিকটাত্মীয়।

এবার শোনো মনোযোগ দিয়ে। প্রজাপতির বিভিন্ন গোত্র বা পরিবারগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন– ১. সত্যিকারের প্রজাপতি (True Butterfly), ২. কাপ্তান (The Skipper) ও মথ-প্রজাপতি (Moth-Butterfly)। লেপিডপটেরার বাদ বাকি পরিবারগুলোর সদস্যরাই হলো মথ।

এবার আমাদের এই দেশে সচরাচর (Common) যে প্রজাপতিগুলো দেখা যায়, সেগুলোর মধ্যে কয়েকটির নাম তোমাদের বলছি, মনোযোগ দিয়ে শুনবে কিন্তু।

এগুলো হলো– লাঠিয়াল (Five-bar Swordtail), উদয়াবল্লী (Common Mormon), সপ্তপদ্মরাগ (Common Rose), বাঘ বা রাজা (Striped Tiger or Indian Monarch), নীলকমল (Blue Tiger), সাত ডোরা (Lime Butterfly), ঝালর (Leopard Lacewing), চিতাবাঘ (Common Leopard), হলুদ ময়ূরী (Peacock Pansy), সেনাপতি (Commander), বনবেদে (Common Sergeant), বনরঞ্জী (Common Nawab), মেঘকুমারী (The Clipper), কৃষ্ণতরঙ্গ (Common Castor), ফিতে ফুলকি (Common Imperial), হলদে সান্ত্রী (Yamfly), হলুদ (Common Grass Yellow), রাগ নকশী (Common Jezebel), হেমশূভ্র (Psyche), তিলাইয়া (Common Pierrot) ইত্যাদি। এছাড়াও দুর্লভ (Uncommon) ও বিরল (Rare) প্রজাতির মধ্যে রয়েছে– স্বর্ণবিহন (Golden Birdwing), হারলেকুইন (Harlequin), কৃষ্ণ যুবা (Black Prince), রূপসী (Jewelled Nawab), ছায়াকরণ (Giant Redeye), কৃষ্ণমনি (Great Archduke), মনিমালা (Popinjay), মোহনা (Rustic), সাজুন্তি (Red Pierrot) ইত্যাদি।

ছোট্ট বন্ধুরা, একটি কথা জেনে রাখো, হাতির যেমন শুঁড় (Proboscis) আছে প্রজাপতিরও তেমনি শুঁড় রয়েছে। যা দিয়ে এরা ফুলের ভিতর থেকে রস (Nectar) বের করে আনে।

আচ্ছা, তোমরা কী বলতে পারবে পৃথিবী

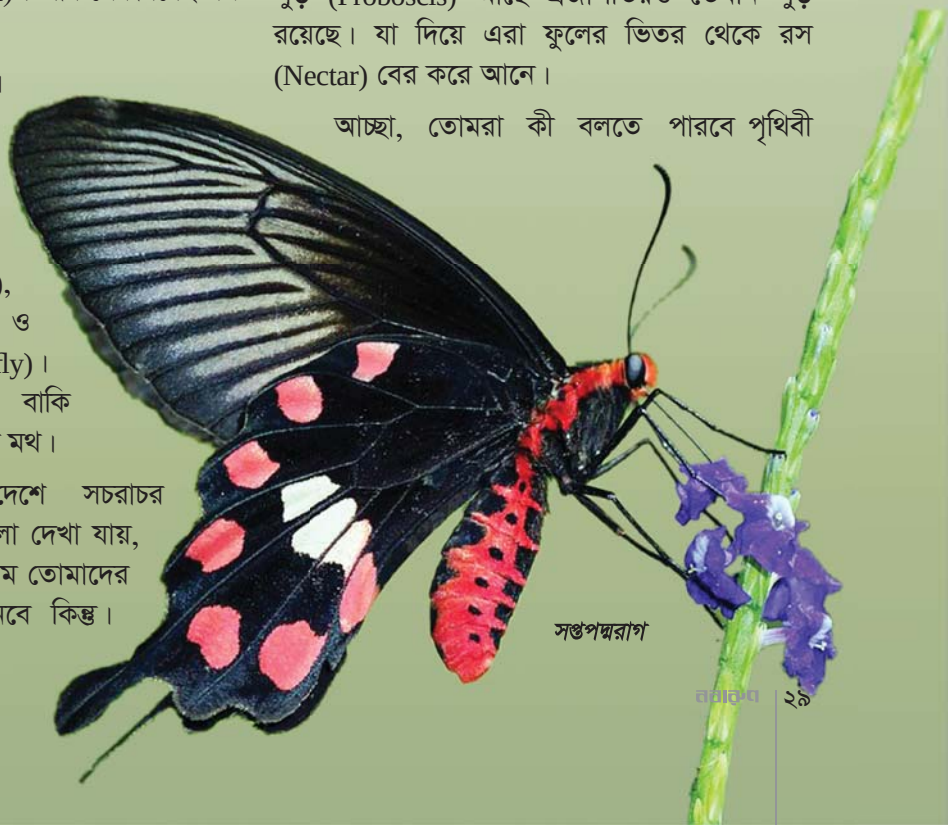

সপ্তপদ্মরাগ

সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে ছোটো প্রজাপতির নাম কী? কি পারবে না?

ঠিক আছে, বলছি। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো প্রজাপতি হলো 'রানি আলেকজান্দ্রার বিহন (Queen Alexandra's Birdwing)'। এই প্রজাপতির ডানা দু'টোর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কতটুকু লম্বা হয় জানো কি? প্রায় পঁচিশ সেন্টিমিটার (সেমি) বা ২৫০ মিলিমিটার (মিমি)। আর সবচেয়ে ছোটো প্রজাতিটির নাম 'পশ্চিমা বামন নীল (Western Pygmy Blue)' লম্বায় যা মাত্র এক সেমি বা ১০ মিমি হয়ে থাকে। তবে, এ দুটো প্রজাপতি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না।

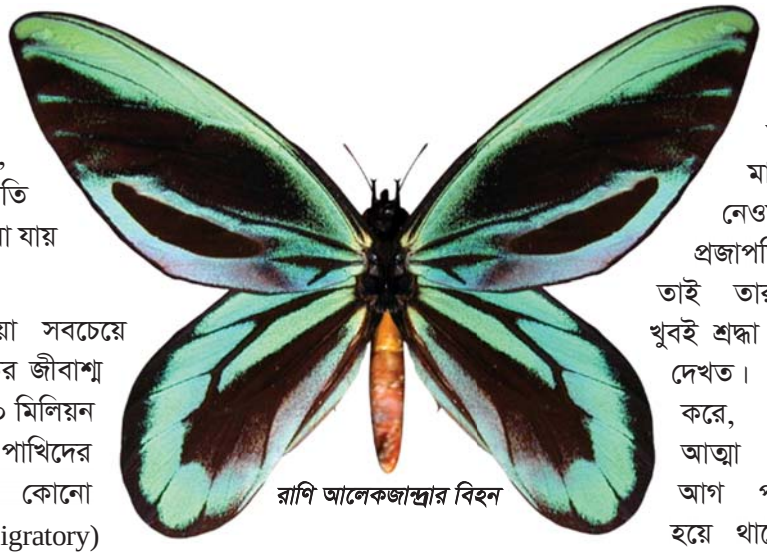

রাণি আলেকজান্দ্রার বিহন

এ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে পুরানো প্রজাপতির জীবাশ্ম (Fossil) ৪০–৫০ মিলিয়ন বছরের পুরনো। পাখিদের মতো কোনো কোনো পরিযায়ী (Migratory) প্রজাতির প্রজাপতি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে সক্ষম। যেমন– মনার্ক প্রজাপতি যা এদেশে বাঘ (Stripped Tiger) নামে পরিচিত।

এবার প্রজাপতি সম্পর্কে তোমাদের মজাদার কিছু তথ্য দিচ্ছি। প্রজপাতি নিয়ে মানুষের মধ্যে অনেক সংস্কার বা কুসংস্কার রয়েছে। যেমন– কারো গায়ে প্রজাপতি বসাকে সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে ধরে নেয়া হয়। এদেশে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক অবিবাহিত লোকের দেহে প্রজাপতি বসলে তার বিয়ের ফুল ফুটল বলে ধরে নেওয়া হয়। সাদা রঙের প্রজপতিকে কোথাও কোথাও সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করা হয়। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রজাপতি নিয়ে বহু পৌরাণিক কাহিনি বা কিংবদন্তী (Myth) প্রচলিত আছে। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় Psyche (সাইকি) অর্থ হলো প্রজাপতি। Psyche-এর শাব্দিক অর্থ Soul বা আত্মা অথবা Mind বা মন। গ্রিকরা বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি মথ প্রজাপতি থেকে বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আত্মার জন্ম হয়। প্রজাপতি নিয়ে জাপানি মিথ হলো– যার ঘরে প্রজাপতি প্রবেশ করে, সবচেয়ে পছন্দের ব্যক্তিটি তাকে দেখতে আসে। দুটি প্রজাপতি একসঙ্গে উড়াকে চীনারা ভালোবাসার প্রতীক বলে মনে করে। ফিলিপিনেরা মনে করে, কোনো ঘরে যদি কালো প্রজাপতি প্রবেশ করে বা এর জন্ম হয়, তবে ঐ পরিবারের কেউ মারা গেছে বা শীঘ্রই মারা যাবে। প্রাচীন ইউরোপিয়রা মনে করত মানুষের আত্মা নেওয়া হয় প্রজাপতির রূপে, তাই তারা প্রজাপতিকে খুবই শ্রদ্ধা ও ভয়ের সাথে দেখত। আইরিশরা মনে করে, মৃত ব্যক্তিদের আত্মা স্বর্গে প্রবেশের আগ পর্যন্ত প্রজাপতি হয়ে থাকে। মেক্সিকোর কোনো কোনো আদিবাসী বিশ্বাস করে যে, প্রজাপতি হলো পৃথিবীর উর্বরতার প্রতীক। মায়া আদিবাসীরা মনে করে, মৃত যোদ্ধাদের আত্মা প্রজাপতির রূপ নিয়ে পৃথিবীতে বিরাজ করে। আসামের নাগাস অঞ্চলের লোকদের বিশ্বাস এই যে, আত্মা পৃথিবীতে এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয় যার সর্বশেষ ধাপে প্রজাপতি হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই প্রজাপতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মার রূপান্তরও শেষ হয়।

এবার প্রজাপতির দৈহিক গঠন সম্পর্কে কিছু বলছি। পূর্ণবয়স্ক প্রজাপতির মাথায় এক জোড়া প্রায় গোলাকার যৌগিক চোখ বা পুঞ্জাক্ষি (Compound Eye) থাকে যা দিয়ে এরা চারদিক দেখতে পারে। প্রজাপতি পুঞ্জাক্ষির সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন রং ও বস্তু শনাক্ত করতে পারে।

এদের লম্বা দেহটি তিনভাগে বিভক্ত, যেমন– মাথা, বুক ও পেট। পেট লম্বা বেলুনাকার যা দশটি খণ্ডে বিভক্ত। সাধারণত দেহ এবং ডানার উপর ও নিচের দিকের রং এবং কারুকাজে পার্থক্য থাকে। মাথার দুপাশে একটি করে শুঙ্গ বা অ্যান্টেনাও (Antenna) রয়েছে। চোখ বাদে পুরো দেহ ছোটো ছোটো লোম ও চ্যাপটা আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। এদের ডানা চারটি ও পা তিন জোড়া।

এবার প্রজাপতির জীবন প্রণালি সম্পর্কে কিছু তথ্য দিচ্ছি। প্রজাপতি দিনের বেলায় ফুল থেকে ফুলে উড়ে বেড়ায় ও ফুলের রস পান করে। ফুলের পরাগায়ণে অর্থাৎ গাছের বংশবিস্তারে এরা বেশ সাহায্য করে। এদের পঞ্চেন্দ্রিয় উন্নত ধরনের। ঠান্ডা মৌসুমে প্রজাপতিরা উড়তে পারে না। এদের স্বাভাবিক কাজকর্ম বা উড়াউড়ি করার জন্য পরিবেশের তাপমাত্রা ২৮°–২৯° সেলসিয়াস থাকা উচিত। এরা শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী, তাই দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এজন্য পরিবেশের তাপমাত্রা এদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

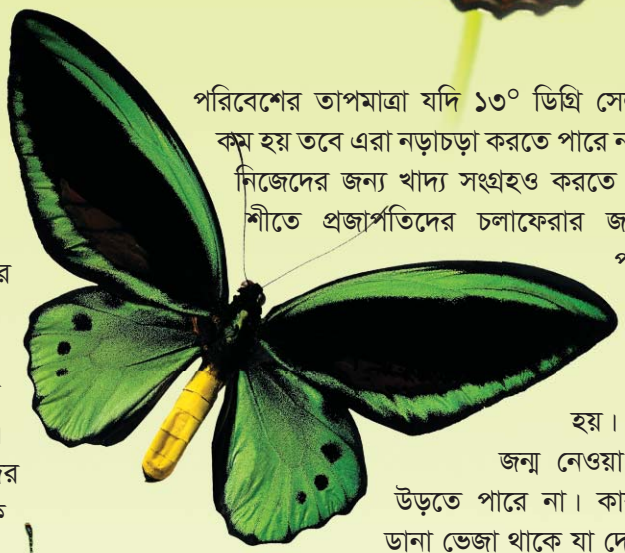

পরিবেশের তাপমাত্রা যদি ১৩° ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম হয় তবে এরা নড়াচড়া করতে পারে না, এমনকি নিজেদের জন্য খাদ্য সংগ্রহও করতে পারে না। শীতে প্রজাপতিদের চলাফেরার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সূর্যের তাপের প্রয়োজন হয়। নতুন জন্ম নেওয়া প্রজাপতি উড়তে পারে না। কারণ এদের ডানা ভেজা থাকে যা দেহের সাথে লেপটে থাকে। কাজেই এদের পুরো দেহ শুকোতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে।

এবার তোমাদের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ তথ্য দিচ্ছি। প্রজাপতির জীবনচক্র (Lifecycle) বড়োই অদ্ভুত যা চার ভাগে বিভক্ত, যেমন– ডিম (Egg), শূককীট (Larva বা Caterpillar), মুককীট (Pupa) ও পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি (Adult বা Imago)। স্ত্রী প্রজাপতি সাধারণত পছন্দের গাছের পাতার উপর বা নিচের দিকে এককভাবে বা গুচ্ছাকারে ডিম পাড়ে। কয়েকদিন পর ডিম ফুটে শূককীট বের হয়। অবশ্য শীতকালে ডিম ফুটতে সময় বেশি লাগে। শূককীট দেখতে লম্বা পোকার মতো ও এদের চোখ প্রজাপতির মতো যৌগিক নয় বরং সরল। গাছের পাতা খেয়ে ও কয়েকবার (সাধারণত পাঁচবার)

দেহের খোলস পালটিয়ে শূককীট আকারে বড়ো হয়। শুককীট এরপর গাছের ডালে শক্ত খোলসের সৃষ্টি করে মুককীটে পরিণত হয় ও এক সপ্তাহ থেকে কয়েকমাস পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে সুপ্তিকাল শেষে একদিন এই খোলস কেটে বেরিয়ে আসে সুন্দর এক প্রজাপতি। এরপর সে সঙ্গী খোঁজে, প্রজনন করে ও বংশবৃদ্ধি করে। বেশিরভাগ প্রজাতির প্রজাপতিই এক থেকে দু'সপ্তাহের বেশি বাঁচতে পারে না। তবে ব্যতিক্রমও আছে। কোনো কোনো প্রজাতি এমনকি বছরখানেকও বেঁচে থাকে, যেমন– বাঘ বা রাজা।

আচ্ছা ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা তো ইতোমধ্যে জেনেছ যে, প্রজাপতি দেখতে বেশ সুন্দর ও বর্ণিল হয়। তাহলে এবার বলো তো এদের বাচ্চাগুলোও কি প্রজাপতির মতোই সুন্দর হয়?

কি বলতে পারছ না তো?

তাহলে মনোযোগ দিয়ে শোনো। আসলে প্রজাপতির মতো শূককীটগুলো অনেক ক্ষেত্রেই তেমন একটা সুন্দর হয় না। প্রজাপতির সঙ্গে এদের চেহারার কোনো মিলই নেই। আসলে বাচ্চাগুলোকে দেখে মোটেও মনে হবে না যে এদের থেকেই এমন সুন্দর ও বর্ণিল প্রজাপতির সৃষ্টি হয়।

আরো জেনে রাখো যে, প্রজাপতির শূককীটগুলো গাছের বেশ ক্ষতি করে। অবশ্য কোনো কোনো প্রজাতির শূককীট ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে কৃষকদের বেশ উপকারও করে। আবার এরা অনেক পাখির কাছেই অত্যন্ত প্রিয় খাবার। কাজেই অনেক প্রজাতির পাখিও প্রজাপতির ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। গাছের বৈচিত্র্য তৈরিতে প্রজাপতি ভূমিকা রাখে।

তোমরা তো অবশ্যই জানো যে, প্রকৃতির সুন্দর সৃষ্টিগুলোর মধ্যে ফুল, পাখি ও প্রজাপতি অন্যতম। তাছাড়া প্রজাপতি পরিবেশের সুস্থতারও নির্ণায়ক। সুন্দর এই প্রজাপতিগুলো দেখে আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু এদের প্রতি আমরা মোটেও সচেতন নই। আমাদের দেশের শিশু-কিশোর এমনকি বড়োরাও সঠিকভাবে প্রজাপতি চিনে না। এদের উপকারিতা সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানে না। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় উদ্ভিদ ও প্রাণী-পাখির মতো প্রজাপতিরও যে ভূমিকা রয়েছে তা অনেকেরই জানা নেই।

ছোট্ট বন্ধুরা, একটি কথা জেনে রাখো যে, এদেশে বর্তমানে কয়টি প্রজাতির প্রজাপতি বিলুপ্তির দোড়গোড়ায় ও কয়টি ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে তার কোনো সঠিক হিসাব নেই। কাজেই এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন। তবে আমাদের প্রাকৃতিক গাছগুলোকে সংরক্ষণ করে প্রজাপতিকে রক্ষা করা সম্ভব। কেননা কিছু কিছু গাছ রয়েছে যার ওপর প্রজাপতিরা সরাসরি নির্ভরশীল। আবার কিছু কিছু প্রজাতি মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন রয়েছে। কাজেই এদের রক্ষা করার ব্যাপারে এখনই সচেতন না হলে এদেরকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। আর এ ব্যাপারে তোমাদেরও অনেক কিছু করার আছে। ■

[প্রবন্ধটির লেখক ও আলোকচিত্রী অধ্যাপক ড. আ ন ম আমিনুর রহমান একজন বন্যপ্রাণী জীববিজ্ঞানী ও বন্যপ্রাণী চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ।]

অন্যরকম জন্মদিন

সৈয়দা নাজমুন নাহার

পিয়ালের মন ভালো নেই। সকাল থেকে বৃষ্টি তাই আজ স্কুলেও যাওয়া হয়নি। ছাত্র হিসেবে খুব ভালো। কিন্তু অন্তর সাথে কিছুতেই পারে না। দুই-এক নম্বর বেশি পেয়ে অন্ত সব সময় প্রথম হয়ে থাকে। আর পিয়াল দ্বিতীয়। তবে পিয়ালের ভালো আচরণের পুরস্কার আর কেউ নিতে পারে না। বরাবর সদাচরণের পুরস্কারটি সে-ই পেয়ে আসছে।

সবই ঠিক ছিল। পিয়াল বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। কিন্তু তাই বলে অতিরিক্ত আদর সে কখনো পায়নি। পরিণীতবোধের ভেতর সবই পেয়েছে। জামা, জুতো, খেলনা। বেড়ানো মা তার পছন্দের খাবারই রান্না করে বেশি। গত দশ বছর বেশ ধুমধাম করে জন্মদিন পালন করেছেন বাবা-মা। বছরের এই দিনটিতে নিজেদের সারা বছরের সঞ্চয় খরচ করেন। সেদিন সব আত্মীয়স্বজন, বন্ধুরা আসে। মা সারাদিন ধরে রান্না করেন। আনন্দ আর আনন্দ।

অনেক সুন্দর সুন্দর গিফট নিয়ে আসে সবাই। ওকে সবাই খুব আদর করে শান্ত স্বভাবের জন্য। পিয়াল এবার ক্লাস ফাইভে পড়ছে আর এবারই দেশব্যাপী বন্যা। থইথই পানি চারিদিকে। মানুষ বাধে, খোলা আকাশের নিচে ঘরের চালে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত রোদে পুড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজছে। খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। ভীষণ কষ্ট তাদের। রিলিফ টিম যাচ্ছে। আর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। নিরাপত্তারক্ষীরা পিটুনিও দিচ্ছে। টিভির পর্দায় প্রতিদিন দেখে।

তাই দেখে মা তাকে বুঝিয়েছেন তোমার মতো বাচ্চারা না খেয়ে ঝড়বৃষ্টিতে কত কষ্ট পাচ্ছে। এসময় কি তোমার জন্মদিন পালন করা উচিত বলো। পিয়াল বলল, সত্যিই তাই।

পিয়ালের জন্মদিন তাই এ বছর পালন করা হবে না। ফুলে, আলোয় ভরে উঠবে না ঘরদোর। অতিথি সমাগম হবে না। একা একা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। দুপুরে ভাত খেয়ে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যায়। বিকেলে বাবা-মা দুজনেই অফিস থেকে ফেরেন। মা এনজিওতে চাকরি করেন রিলিফের কাজ নিয়ে। মা খুব ব্যস্ত। ঠিক সময় ঘরে ফিরতে পারেন না। প্রায়ই রাত হয়ে যায়। আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছেন।

নাশতার টেবিলে দেখে তার প্রিয় খাবারগুলো সাজানো মিষ্টির মধ্যে কাঁচাগোল্লাটা তার খুব প্রিয়। বাবা তাও এনেছেন। ঘন দুধের পায়েস রেধেছেন মা। নুডুলস আরো কত কী। অনেক দিন পর মজা করে সবাই খেলাম। নাশতার শেষে যখন খেলতে যাব। মা-বাবা দুজনেই বললেন। হ্যাপি বার্থডে, দুই গালে দুজনে চুমো খেলেন মা তার শাড়ির আঁচলের নিচ থেকে বলটি বের করে দিলেন। সে বলটির জন্য বায়না করছিল গত কয়েক দিন ধরে। মা-বাবা দুজনেই বললেন, তোমার জন্মদিন পালনের জন্য যে টাকা রেখেছিলাম তা বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য দেওয়া হয়েছে। তাতে বন্যার্তদের অনেক উপকার হবে। একদিনের আনন্দ আমরা অসহায় মানুষদের সাথে ভাগ করে নিলাম। এমন করে তার জন্মদিন পালন হবে ভাবতেই পারেনি। বল পেয়ে মুহূর্তেই সব কষ্ট ভুলে যায়। মন ভালো হয়ে যায়। মাকে জানিয়ে বল নিয়ে মাঠের দিকে ছুটে যায়। ■

ফারাহনাজ সিদ্দিকী সিমিন, অষ্টম শ্রেণি, স্কলার্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা

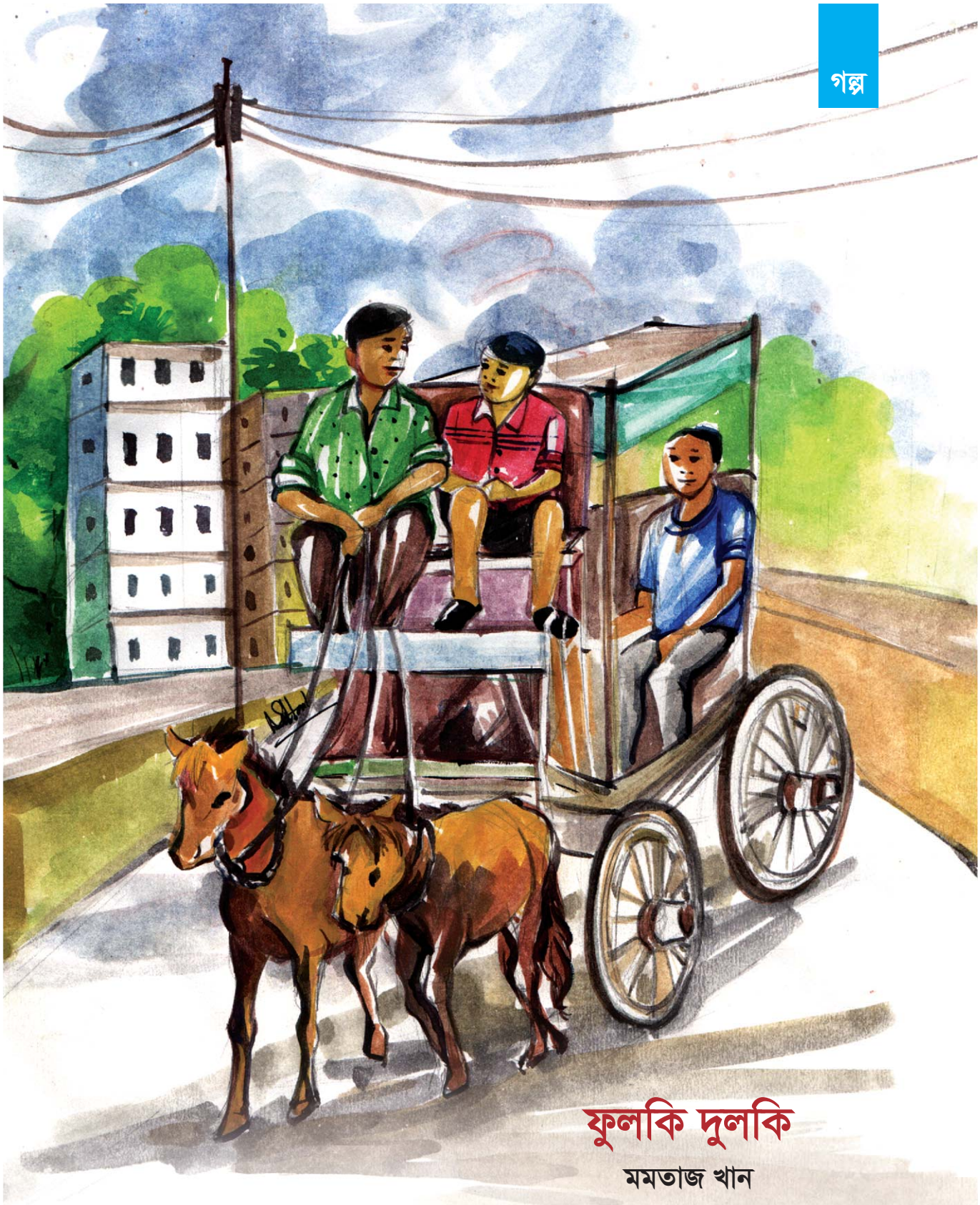

ফুলকি দুলকি

মমতাজ খান

ইমনের বাবা ঘোড়ার গাড়িচালক। ওদের দুটো ঘোড়া এবং একটা টমটম গাড়ি আছে। টমটমের আয়ে ওদের সংসার চলে। ওরা তিন ভাই এক বোন। ইমনের বড়ো ভাই রুমান লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্য তার খুব ইচ্ছে ছিল লেখাপড়া করার কিন্তু সংসারের টানাটানির জন্য পারেনি। রুমান যখন ক্লাস নাইনে উঠল তখন তার খুব দরকার ছিল একজন প্রাইভেট টিচারের কাছে পড়ালেখা করার। কিন্তু অভাবের কারণে হয়ে উঠেনি। রুমান খুব ভালো ছাত্র। তাই সে একা একা পড়েও পাশ করল। কিন্তু ক্লাস টেনে উঠে খুব সমস্যায় পড়ে গেল। বাবাকে বলল, বাবা একজন টিচার না রাখলে আমি পাশ করতে পারব না। বাবা বললেন, বেতন কত দিতে হবে?

রুমান ভীতু গলায় বলল, দুহাজার টাকা তো লাগবেই বাবা। বাবা বললেন, এত টাকা। বলিস কী? এত টাকা আমি পাবো কোথায়? পড়ালেখা বাদ দে। কী বলছ বাবা। এত কষ্ট করে এত দূর পর্যন্ত এলাম আর এখন ছেড়ে দেবো?

কী করবি বল, যে টাকা রোজগার করি তাতে তো সংসারই চলে না।

থাক বাবা, মাস্টার লাগবে না। আমি নিজে নিজেই পড়ব। কিন্তু এত চেষ্টা এবং কষ্ট করেও পাশ করতে পারল না রুমান। শেষে লেখাপড়া ছেড়েই দিল। একটা রং এর দোকানে কাজ নিল রুমান। ইমনের কিন্তু খুব ইচ্ছা সে অনেক লেখাপড়া করবে। পাইলট হতে চায় ইমন। আকাশে আকাশে উড়ে বেড়ানোর তার ভীষণ শখ। একদিন ইমনের বাবার খুব জ্বর হলো। তিনি রুমানকে ডেকে বললেন, আজ তুই গাড়িটা নিয়ে যা তো বাবা। আমার শরীরটা বড়ো খারাপ করেছে।

আচ্ছা বাবা আমি যাচ্ছি। ইমন বায়না ধরল সে আজ গাড়ি করে ঘুরে বেড়াবে। রুমানকে জাড়িয়ে ধরে বলল, ভাইয়া আমি আজ তোমার সঙ্গে যাব। রুমান বলল, আমার সঙ্গে কোথায়?

তুমি গাড়ি চালাবে আর আমি বসে থাকব। আজ আমার স্কুল বন্ধ তো।

ঠিক আছে চল।

ইমনকে নিয়ে রুমান গাড়িতে এসে উঠল। চালকের সিটে গিয়ে বসল রুমান আর ইমন তার পাশে। খুব মজা লাগছে। ইমনের ঘোড়াগুলো কেমন টমটম শব্দ করে ছুটছে আর তার সঙ্গে ছুটছে গাড়ি। সদরঘাটের ট্রাফিক পোস্টের সামনে এসে জ্যামে আটকা পড়ল। তাদের গাড়ি প্রায় আধাঘণ্টা বসে থাকতে হলো। ইমনের হঠাৎ মনে হলো ঘোড়া দুটি ফিসফিস করে একে অপরকে কী যেন বলছে। একটু মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা করতেই ইমন বুঝতে পারল ওদের ভাষা। ইমন শুনতে পেল ফুলকি দুলকিকে বলছে-

ইস! একটু শান্তি পেলাম। জ্যামটা যদি আরো কিছুক্ষণ থাকে, কী বলিস দুলকি?

দুলকি বলল। কী আর বলব বলো। দৌড়াব কী আমার তো হাঁটতেই ইচ্ছে করছে না। কয়েকদিন ধরে শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছেরে।

জানি তো। কিন্তু কী করবি বল, মালিক তো আর সেটা বুঝবে না।

নারে ভাই বুঝবে না। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই কষ্ট, ফুলকি বলল।

জানিস আমার একটা ছোটো বোন আছে, থাকে অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে। কী স্বাধীন সুখের জীবন তার। দুলকি বলল, শুধু তোমার বোন কেন আমাদের স্বজাতি যারা মুক্ত বনজঙ্গলে বাস করছে তারা সবাই ভীষণ সুখী আর ভাগ্যবান। অথচ আমাদের কী দুর্ভাগ্য দেখ রাতদিন রোদবৃষ্টি মাথায় করে নিষ্ঠুর কতগুলো মানুষকে বহন করে চলি। ওদের একটু মায়াও হয় না আমাদের জন্য।

ফুলকি বলল, তুই কী জানিস দুলকি, প্রাণীজগতে সবচেয়ে নিষ্ঠুর আর স্বার্থপর হচ্ছে মানুষ। কথা শেষ হবার আগেই জ্যাম ছেড়ে গেল। রুমান হাতের চাবুক দিয়ে ফুলকি দুলকির পিঠে কষে বারি লাগাল আর মুখে বলল, এই হাট হাট।

ঘোড়া দুটো প্রাণপণে ছুটতে লাগল। ইমনের বুকের মাঝখানে চিনচিনে একটা ব্যথা অনুভব করল তার মনে হলো, সত্যই তো। এটা তো ভারি অন্যায়। এত বড়ো একটা গাড়ি এতগুলো লোক দুটো বোবা প্রাণী প্রাণান্ত কষ্ট করে সারাদিন টেনে নিয়ে চলে আবার চাবুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয় এটা কেমন বিচার? আমরা বর্বর যুগ পার করে সভ্য যুগে বাস করছি। কিন্তু এটা কোন ধরনের সভ্যতার নিদর্শন। ইমন ভাবে এতে কী আমাদের মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে না? এই আধুনিক সভ্যতা আর অত্যাধুনিক গাড়ি যন্ত্রপাতির

যুগে মানুষ মানুষের বাহন হয়, পশু মানুষের বাহন হয় এটা কেমন নীতি? ফুলকি আর দুলকি পায়ের খুরে খট খট শব্দ তুলে ছুটছে। গুলিস্তানে গোলাপ শাহ মাজারের সামনে এসে আবার ট্রাফিক সিগন্যালে টমটম আটকে গেল আবার। ফুলকি দুলকি দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে আর ঘামছে। ইমন স্পষ্ট শুনতে পেল দুলকি বলছে,

আমার শরীরটা এত খারাপ আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। ইচ্ছে করছে বসে পড়ি। ফুলকি বলল, সে উপায় কী আছে। ঘাড়ের উপর এত বড়ো একটা গাড়ির রশি বাঁধা, বসবি কীভাবে?

কিন্তু আমার যে বড়ো কষ্ট হচ্ছে। হলেই বা কী, নিষ্ঠুর মানুষরা কী সে কথা বুঝবে? তুই এক কাজ কর, আস্তে আস্তে হাঁট। দুলকি আসলেই হাঁটতে পারছে না ইমন। দেখল তার চোখ বেয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছে দুলকি। রুমান আবার শপাং করে চাবুক বসাল দুলকির পিঠে। ইমন আঁতকে উঠল। চিৎকার করে বলল, ভাইয়া দুলকিকে মেরো না।

রুমান ঘাড় ঘুরিয়ে রাগি গলায় বলল, তোর আবার কী হলো? ও হাঁটছে না দেখছিস না? ওর শরীর ভালো না ভাইয়া। আমাকে এখানে নামিয়ে দাও। আমি আর কোথাও যাব না। রুমান ধমকে উঠল। চুপ করে বসে থাক। দেব এক থাপ্প। ইমন গোমড়া মুখে চুপ করে বসে রইল। বেলা প্রায় তিনটার সময় ঘোড়া পট্টির ওদিকে একটা ক্ষ্যাপ পড়ল। প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিয়ে ঘোড়াদের খাওয়াতে এবং নিজেরাও খেতে বাসায় এল রুমান এবং ইমন। লাইট পোস্টের থামের সঙ্গে ফুলকি দুলকিকে বাঁধতেই দুলকি ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। রুমান এগিয়ে এসে দুলকির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, আরে কী হলো তোর? ইমন ভারি গলায় বলল। বলেছিলাম না দুলকি অসুস্থ। হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে। শোন ইমন তুই ওদের খাবার আর পানি নিয়ে আয়।

আচ্ছা ভাইয়া, তুমি গোসল করতে যাও। আমি ওদের খাবার দিচ্ছি। ইমন গামলা ভর্তি ছোলা আর ভুষি এনে ওদের সামনে রাখল। আর ওমনি ফুলকি গপ গপ করে খেতে শুরু করল। ফুলকি যে ভীষণ ক্ষুধার্ত তার খাবারের নমুনা দেখেই বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু দুলকি কিছুই খাচ্ছে না। সে ঘাড় কাত করে শুয়ে আছে। ইমন ওর মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, দুলকি খাও। দুলকি চোখ তুলে ইমনের দিকে তাকাল ইমন দেখল দুলকির চোখ দুটি কেমন যেন ঘোলাটে। ইমন ছুটে এল তার বাবার কাছে। বাবারও অনেক জ্বর। তবু তাকে ধাক্কা দিয়ে ইমন বলল, বাবা বাবা দুলকি কিছুই খাচ্ছে না। বাবা ক্ষীণ গলায় বললেন, কেন? বাবা দুলকির অসুখ হয়েছে। বাবা বললেন, চল তো দেখি।

ইমন তার বাবাকে ধরে ধরে দুলকির কাছে নিয়ে এল। দুলকি মাটিতে ঘাড় গুজে শুয়ে আছে। ইমনের বাবা ওর মাথায় হাত রেখে ডাকছেন। দুলকি ও দুলকি। দুলকি মাথা তুলে তাকালো, বাবা বললেন। খাচ্ছিস না কেন? রাগ করেছিস? রুমান তোকে মেরেছে?

দুলকি আবার মাথা গুজে শুয়ে রইল। ইমনের বাবা বললেন, রুমান কোথায় রে। ডাক্তার আনতে হবে। ভাইয়া গোসল করতে গেছে। আসলে বলবি শিগ্‌গির ডাক্তার আনতে। আমি আর বসতে পারছি না। আমাকে নিয়ে চল। কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড হলো। দুলকি সামনের পা দুটি উঠিয়ে ইমনের বাবার কাঁধের ওপর রাখল এবং মুখটা তার গালে ঠেকালো। দুলকির চোখ বেয়ে তখন টপটপ করে পানি ঝরছে। ইমনের বাবা দুলকিকে অনক আদর করলেন। তারপর পা দুটি নামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তুই শুয়ে থাক দুলকি।

সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার এলেন। পশু হাসপাতালের ডাক্তার তিনি। ঔষধ লিখে দিয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুতেই দুলকিকে ঔষধ খাওয়ানো গেল না। সে হা করবে না। রুমান-ইমন দু-ভাই মিলে অনেক চেষ্টা করল। শেষে বিরক্ত হয়ে রুমান চলে গেল। ইমন কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত বসে রইল। ওদের কাছে ইমন এক সময় শুনতে পেল ফুলকি দুলকিকে বলছে। দুলকি তুই ঔষধ খাচ্ছিস না কেন?

দুলকি বলল, ভালো লাগে না ঔষধ খেতে। ফুলকি বলল, তাহলে সুস্থ হবি কীভাবে? দুলকি নিস্তেজ গলায় বলল আমি আর সুস্থ হতে চাই না। ফুলকি বলল, কেন রে?

এত কষ্ট করে এই নিষ্ঠুর মানুষদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। ইমনের চোখে পানি চলে এল। সে হঠাৎ পশুদের ভাষা বুঝতে পারছে। এজন্য তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ■

গল্প

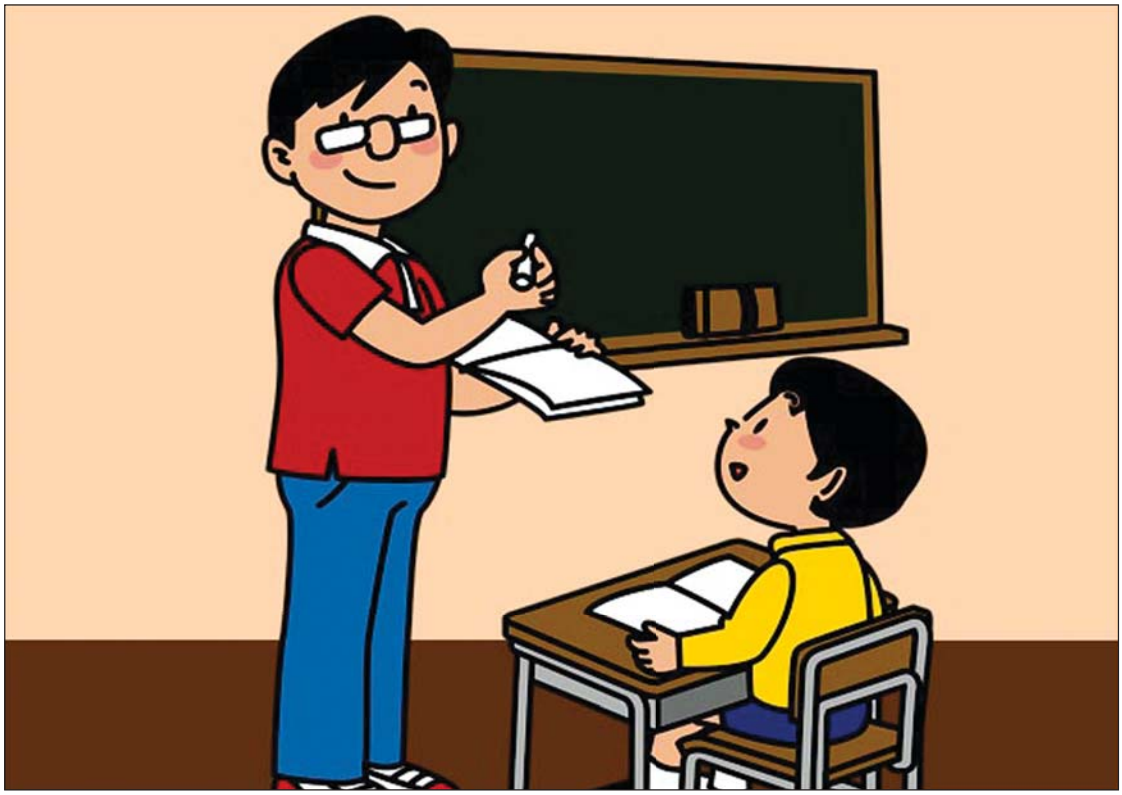

কেমন জব্দ

আয়েশা তাসনিম রইতা

আজ বাড়িতে নতুন মাস্টার মশাই আসছেন। তার আগেও আরো তিনজনের আগমন ঘটেছিল। কিন্তু কেউই এ বাড়িতে বেশিদিন টেকেনি। বাবা তো রেগে মেগে বলেই বসলেন যে, 'এই শেষবার, এই মাস্টারও যদি আমার ছেলেকে পড়াতে না পারে তাহলে আর মাস্টারই রাখব না। পড়াতে এসে খালি ভোঁস ভোঁস করে নাক ডেকে ঘুমাবে? কক্ষনো না। কাভি নেহি।'

আমি অবশ্য বেজায় খুশি। আগের তিনজনের মতো আবারও যদি মাস্টারের চায়ে ঘুমের ওষুধের গুঁড়ো মিশিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই তো কেল্লাফতে। আমাকে আর মাস্টারের কাছেই পড়তে হবে না।

সন্ধেবেলা নতুন জামাকাপড় পরে বাবুটি সেজে মাস্টারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠিক সন্ধে ৬টায় মাস্টারের আগমন ঘটল। আমি ঘড়ি দেখলাম এক মিনিটও দেরি নয়। মাস্টারের চেহারাটা দেখবার মতো। আর্মিদের মতো ছোটো করে চুল ছাঁটা, গোলাকার মুখ, দাড়িগোঁফ কামানো আর চোখে গোল ফ্রেমের চশমা। তবে দেখবার মতো জিনিস হচ্ছে মাস্টারের ভুঁড়িটা। ইয়া বড়ো।

'তোমার নাম কি খোকা? মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন।

'জ্বী... আমার... দীপ্ত। আমি... অ্যাঁ... ক্লাস থ্রিতে পড়ি।' আমি জবাব দিলাম।

'তুমি কী ভয় পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ... মানে... না...মানে একটু একটু।'

'ভয়ের কিছু নেই। আমি প্রথমদিন কাউকে শাস্তি দেই না।'

'আচ্ছা তোমাদের বাড়িতে রান্না করে কে? ভিন্ন প্রসঙ্গ টানলেন মাস্টার।

‘রান্না? রান্নাবান্না তো মা-ই করে।’

‘তো ভালো। আমি আবার কাজের লোকদের রান্না খেতে পারি না। (একটু থেমে) আচ্ছা সে যাই হোক। বলোত শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রের কর্তব্য কী কী?’

‘উম... শিক্ষককে সম্মান করতে হবে, তাঁদের কথা মানতে হবে...অ্যাঁ...তাঁদের আবাধ্য হওয়া যাবে না... ইত্যাদি।’

‘হুমম, হয়েছে। কিন্তু আসল যেটা সেটা হলো শিক্ষকদের সেবা করতে হবে। শিক্ষকেরা ছাত্রের কাছে দেবতা তুল্য। হিন্দুরা তাদের দেবতাকে যেমন নানারকম খাবার দিয়ে পুজো করে, তেমনি ছাত্রেরও উচিত শিক্ষককে দেবতার আসনে বসিয়ে তাঁর সেবা করা।’

আমি মাস্টারের ইঙ্গিতটা বুঝে গেলাম। বাথরুমে যাওয়ার নাম করে মাকে গিয়ে বললাম মাস্টারকে কিছু নাস্তা দিতে। মনে মনে বেশ খুশিই হলাম যে, এই মাস্টারকে কাবু করা তো আমার বাম হাতের খেলা।

(২)

পরেরদিন মাস্টারের চায়ে আমি ঘুমের ওষুধের গুঁড়ো মিশিয়ে দিলাম। কাজটা সেরে ভদ্র ছেলের মতো বসে একটা রিডিং পড়া শুরু করে দিলাম। একটু পরেই ফুলি খালা একটা ট্রেতে করে চা-বিস্কুট নিয়ে এল। ট্রেটা দেখে মাস্টার খুশি হতে পারলেন না। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, কখন সে চাটা খাবে। পিরিচের বিস্কুট শেষ করে মাস্টার আমাকে বলল,

‘দীপ্ত, তুমি চা খাও?’

‘হ্যাঁ, খাইতো। কিন্তু মা দিতে চায় না।’

‘তাহলে এক কাজ করো। এটা খেয়ে ফেলো। আমি চা খাই না।’

আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম,

‘না...না...আ-আমি চা খাই না।’

‘এক্ষুণি তো বললে, যে তুমি খাও!’

‘হ্যাঁ আসলে খাই। কিন্তু আমার পেট গরম হয়েছে তো, তাই গরম জিনিস খাওয়া বারণ।’

‘ঠিক আছে তাহলে দরকার নেই।’

আমি একটা স্বস্তির নিঃস্বাস ফেললাম। ভাবলাম, আজকে তো বেঁচে গেলে চাঁদ। কাল তোমার খবর আছে।

(৩)

পরদিন দেখলাম মা মাস্টারের জন্য শরবত বানাচ্ছে। আমি আজ শরবতের ওষুধের গুঁড়ো মিশিয়ে দিলাম। খানিক বাদে ফুলি খালা ট্রেতে করে শরবত আর লাড্ডু নিয়ে এল। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে মাস্টারের শরবত খাওয়ার দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম।

বেশ খানিকক্ষণ হয়ে গেছে। মাস্টারের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। তিনি একটা হাইও তোলেননি পর্যন্ত। মাস্টার চলে যাওয়ার পর আমি ঘরে গেলাম গিয়ে দেখি আমার ছোটো ভাই ধ্রুব ঘুমাচ্ছে। আমার কেমন জানি খটকা লাগল। আমি রান্নাঘরে গিয়ে ফুলি খালাকে জিজ্ঞেস করলাম,

‘ফুলি খালা, আমার শরবত কই?’

‘তোমারডা ফ্রিজে রাইখা দিসি, খাইয়া লও।’

‘ধ্রুব খেয়েছে?’

‘হ। হেয় তো মাস্টারের জন্য রাখা শরবতডা খাইয়া ফালাইছে। পরে আমি মাস্টারের আরেক গেলাস বানায়া দিসি।’ আমার সন্দেহই ঠিক। বাঁদরটা আর কাজ পেল না। ঐ শরবত তোকে কে খেতে বলেছিল? হাঁদারাম একটা। এখন ঘুমা।’

(৪)

আজ বাবা বাড়িতে রয়েছেন। কোনোমতে আজ যদি কিছু করে ফেলা যায়, আর সেটা যদি বাবার চোখে পড়ে, তাহলেই হয়েছে। আর দেখতে হবে না বাছাধনকে। মা আজকে বিরিয়ানী রান্না করেছে। গন্ধে সারা বাড়ি ম ম করছে। আমি আজকে খুব সতর্ক হয়ে থাকব। ব্যাটা আজই তোমার এ বাড়িতে শেষ দিন। আজ এমন প্ল্যান করেছি না, তোমার খবর

আছে। মাস্টার আসার পর আমি বাথরুমে যাওয়ার নাম করে রান্নাঘরে এলাম। দেখলাম মা মাস্টারের জন্য বিরিয়ানী বাড়ছে। আমি মাকে বললাম,

'মা ট্রেটা আমাকে দাও আমি নিয়ে যাই।'

'তুই পারবি না, পরে ফেলেটেলে দিবি, এরচেয়ে ভালো ফুলিই নিয়ে যাক।'

'না না, আমিই পারব, দাও। আরে বাবা দাওনা।'

'আচ্ছা ঠিক আছ ধর, সাবধানে। ফুলি তুই ওর সাথে যা। দেখিস ও যেন ফেলে না দেয়।'

আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। ফুলি খালা আমার সাথে গেলে, কাজটা সারবো কিভাবে? বেশ খানিকটা গিয়ে আমি ফুলি খালাকে বললাম,

'ফুলি খালা, আমি পানি খাব।'

'তয় ট্রেটা আমারে দাও, আমি রাইখা আসি, আর তুমি পানি খাইয়া আসো।'

'নানা আমি নিয়ে যাই, বর তুমি পানি নিয়ে আসো।' 'কিন্তু তুমি যদি ফালায়া দাও? এক কাম কর ট্রেডা এই টেবিলে রাখো। আমি পানি নিয়া আসি।' 'আচ্ছা ঠিক আছে যাও।'

ফুলি খালা চলে যেতেই আমি আমার পকেট থেকে একটা শিশি বের করে তার তরলটুকু বিরিয়ানীর উপর ছিটিয়ে দিলাম। ব্যাস কাজ শেষ। এখন শুধু ফলাফলের পালা।

(৫)

বিরিয়ানী প্লেট মাস্টারের সামনে রাখতেই তিনি বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিলেন। আমাকে বললেন, 'দীপ্ত, তুমি বাংলা বইয়ের ৩২ পৃষ্ঠার প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখ।'

আমাকে লিখতে দিয়ে মাস্টার গপাগপ বিরিয়ানী খেতে লাগলেন। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছি। মিনিট দশেক পর মাস্টার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়ে...মানে...দীপ্ত, তোমাদের...বাথরুমটা কোনদিকে?' আমি যার পর নাই খুশি হয়ে মাস্টারকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিলাম। যাক বাবা! এতদিনে কার্যসিদ্ধি হলো। জোলাপ মেশানো বিরিয়ানী খেয়ে মাস্টারের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। তিনি বার বার ঘর থেকে বাথরুম আর বাথরুম থেকে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন। সৌভাগ্যবশত ব্যাপারটা বাবার চোখে পড়ল এবং পরদিন তিনি ঘোষণা দিলেন, এমন ফাঁকিবাজ মাস্টার তিনি রাখবেন না। পড়ানো বাদ দিয়ে সারাদিন বাথরুমে বসে থাকা তিনি একদমই বরদাস্ত করবেন না। মাস্টারও এদিকে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। একদিনে তাঁর সাধের ভুঁড়ির যে দশা হয়েছে, তারপর তিনি আর এ বাড়িতে পড়াতে সাহস করলেন না।

আর এদিকে আমার খুশি দেখে কে! এখন আমি সারাদিনই হেসে খেলে কাটিয়ে দিতে পারব। আমি এখন স্বাধীন। আর বাবা তো বলেছিলেন যে আর মাস্টার রাখবেন না। তার মানে আমাকে আর পড়াশোনা করতে হবে না। শুধু খেলা আর খেলা। কী মজা!

পরিশিষ্ট

আমি এখন বসে বসে রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' কবিতাটি মুখস্থ করছি। কিছুতেই মুখস্থ হচ্ছে না। রাত দশটা বেজে গেছে। অথচ বাবা বলেছেন পড়া শেষ করলে তবেই খেতে পাবে। এখন বাবা আমাকে পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি প্রত্যেকদিন একগাদা পড়া দেন, আর পড়া শেষ করতে না পারলে পিঠের উপর সপাং সপাং বেতের বাড়ি পড়ে। এখন খেলা তো দূরের কথা, বরং সময় পেলেই আমি পড়া তৈরি করতে লেগে যাই। আগে যদি জানতাম আমার এই পরিণতি হবে, তাহলে মাস্টারকে বিদায় করার চিন্তা মাথাতেই আনতাম না। মাস্টারকে জব্দ করতে গিয়ে নিজেই কেমন জব্দ হয়ে গেলাম! এখন নাকের পানি চোখের পানি এক করে পড়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ■

নবম শ্রেণি, শেরেবাংলা নগর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন

তারিক মনজুর

বাক্য লিখতে গেলেই দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি অনেক রকমের চিহ্ন বসে। এগুলোর কী প্রয়োজন, পিলটু অনেক ভেবেছে। কিন্তু উত্তর না পেয়ে সে ভাষা-দাদুর বাসায় গিয়ে হাজির।

'কী ব্যাপার, পিলটু? কিছু জানতে এসেছ বুঝি?' বিকালবেলা হঠাৎ করে পিলটুকে দেখে ভাষা-দাদু প্রশ্ন করেন।

পিলটু খুব ইতস্তত করছিল। সে ভাবছিল, ভাষা-দাদু তো বাংলা ভাষার ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন। কিন্তু তিনি কি দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলনের ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন?

'পিলটু, কথা বলছ না কেন? কোনো সমস্যা?' ভাষা-দাদু এবার খানিক অবাক হন।

'না, বলছিলাম, ভাষার মধ্যে দাঁড়ি কমা সেমিকোলন...', পিলটু খুব দ্বিধা নিয়েই বলল, 'এগুলো কি ব্যবহার না করলে হয় না?'

'হ্যাঁ, হয়! এগুলো ব্যবহার না করলেও হয়!' ভাষা-দাদু একটু রহস্য করেন।

'আসলেই হয়?' পিলটুর বিশ্বাস হতে চায় না।

'আসলেই হয়।'

'কিন্তু কীভাবে?' উত্তর শোনার জন্য পিলটুর আর তর সইছে না।

'দাঁড়াও আগে লাঠিটা নিয়ে নিই।' ভাষা-দাদু হাতে লাঠি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এখন বিকাল। ঘরে বসে কি এইসব আলাপ চলে? চলো নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।'

পিলটুকে নিয়ে ভাষা-দাদু বাইরে বেরিয়ে আসলেন। নদীর ধার পর্যন্ত আসতে আসতে দাদু এটা নিয়ে বলেন, ওটা নিয়ে বলেন। কিন্তু দাঁড়ি কমা নিয়ে কোনো কথাই বলেন না। পিলটু মনে করল, দাদু মনে হয় ওগুলোর কথা ভুলে গেছে। তাই নদীর কাছে আসা মাত্রই বলল, 'কই দাদু, বললে না তো, দাঁড়ি কমা সেমিকোলন ছাড়া কীভাবে ভাষা হয়?'

ভাষা-দাদু এবার হাসেন। বলেন, 'এই যে বাড়ি থেকে নদী পর্যন্ত এতটা পথ কথা বলতে বলতে এলাম।

একবারও তো দাঁড়ি কমা আর সেমিকোলন ব্যবহার করিনি।'

'তাহলে, বই পড়তে গেলে এত দাঁড়ি-কমা আসে কেন?' পিলটুকে খানিক ক্ষিপ্ত মনে হয়। এইসব দাঁড়ি-কমা ওকে কী কষ্ট দিচ্ছে, ওই ভালো জানে।

'হ্যাঁ, এবার তুমি আসল জায়গায় এসেছ।' ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, 'মুখের ভাষার জন্য দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন এইসব লাগে না। কিন্তু লেখার ভাষার জন্য এগুলোর খুব প্রয়োজন।'

'কিন্তু এটাই তো আমাকে জানতে হবে।' ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী পিলটু জানতে চায়। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী মানে – ও বিজ্ঞানে ভালো। সবাই বলে, ও একদিন বড়ো বিজ্ঞানী হবে।

ভাষা-দাদু নদীর ধারে এবার বসলেন। বললেন, 'এগুলোকে বলে বিরামচিহ্ন বা যতিচিহ্ন। বিরাম মানে বিরতি। আমরা মুখে যখন কথা বলি, তখন একটানা গড়গড়িয়ে সব কথা বলি না। কথার মাঝে কম-বেশি করে আমরা থামি।'

'সে তো সবাই জানে। কথার মাঝে কম-বেশি করে তো সবাই থামে।'

'কিন্তু লেখার ভাষায় কোথায় কম আর কোথায় বেশি থামতে হবে, বিরামচিহ্নগুলো সেটাই দেখিয়ে দেয়। বিরাম বা বিরতির সাথে সম্পর্ক বলে এগুলোকে বলে বিরামচিহ্ন।'

'যদি আমরা লেখার সময় বিরামচিহ্ন না দেই তো?' পিলটু আসলে জানতে চাইছে, লেখার সময় বিরামচিহ্ন না দিলে সমস্যা কোথায়?

'না দিলে পড়তে গেলে কিছু সমস্যা তো হবেই। যেমন, মুখে কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। অনেক সময় অবাক হয়ে যাই।' ভাষা-দাদু বোঝানোর ভঙ্গিতে বলতে থাকেন, 'এখন লেখার সময় ধরো জিজ্ঞাসা চিহ্ন, অবাক চিহ্ন ব্যবহার করা হলো না। তাহলে আমাদের বুঝতে সমস্যা হবে – কোন কথাটা সাধারণভাবে বলা হলো, কোন কথাটা প্রশ্ন করে বলা হলো, আর কোন কথাটা অবাক হয়ে বলা হলো।'

'ভাষা-দাদু, এগুলো কোত্থেকে এল, বলতে পারো?' পিলটু জানতে চায়।

'বিরামচিহ্নের প্রয়োগের ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্ব দেয়া হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। অর্থাৎ তিনিই তাঁর লেখায় দারুণভাবে দাঁড়ি কমা সেমিকোলন ব্যবহার করেন।'

'বিদ্যাসাগর এগুলো কোথায় পেলেন?'

'ইংরেজি ভাষাতে এইসব চিহ্ন আগে থেকেই ছিল। আমরা ইংরেজির অনুকরণে বাংলাতেও বিরামচিহ্ন ব্যবহার করতে শুরু করি ১৮০১ সাল থেকে।'

'তার মানে, দাঁড়ি কমা সেমিকোলন এগুলো সব আমরা নিয়েছি ইংরেজি থেকে?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। একটু ভুল হচ্ছে। কমা, সেমিকোলন, ড্যাশ, কোলন ইত্যাদি সব বিরামচিহ্ন আমরা ইংরেজি থেকে নিয়েছি। কিন্তু দাঁড়ি আমরা ইংরেজি থেকে নেইনি। দাঁড়ি আমাদের আগে থেকেই ছিল।'

'মানে?' পিলটু আবার প্যাঁচের মধ্যে পড়ল।

'এত অবাক হচ্ছ কেন?' ভাষা-দাদু এবার সহজ করেন, 'ইংরেজিতে কি দাঁড়ি দেখেছ? ইংরেজি বাক্যের শেষে কী দেখতে পাও?'

'তাই তো! ওটা তো দাঁড়ি নয়', পিলটু বলে, 'ওটা তো ফুলস্টপ!'

'হ্যাঁ, ফুলস্টপ। আমরা ইংরেজি থেকে সব নিয়েছি। শুধু ফুলস্টপ নিইনি। কারণ, দাঁড়ি আমাদের আগে থেকেই ছিল।' ভাষা-দাদু এবার ইতিহাস বর্ণনা শুরু করেন, '১৮০১ সাল থেকে বাংলা গদ্য চালু হয়। এর আগে পর্যন্ত সব ছিল কবিতা। আর বাংলা কবিতায় আগে শুধু দাঁড়ি ব্যবহার হতো।'

'শুধুই দাঁড়ি? আর কিছু না?'

'দাঁড়ি। তবে দুই রকম দাঁড়ি। কবিতার প্রথম লাইনের শেষে এক দাঁড়ি। আর দ্বিতীয় লাইনের শেষে দুই দাঁড়ি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুই দাঁড়ি আমি কোথায় যেন দেখেছি।' পিলটু মনে করার চেষ্টা করে।

'মনে না থাকলেও সমস্যা নেই। দুই দাঁড়ি তুমি সামনে আরও অনেক দেখতে পাবে। ... তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল, পিলটু? দাঁড়ি আমাদের আগে থেকেই ছিল। তাই –'

'তাই ফুলস্টপকে নেয়া হয়নি। এই তো?'

ভাষা-দাদু হাসতে হাসতে বলেন, 'হ্যাঁ, এই।' ■

ঐতিহ্যবাহী সাকরাইন বা ঘুড়ি উৎসব

মো. সরোয়ার হোসেন

সাকরাইন পুরান ঢাকার একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব। সাকরাইন উৎসব মূলত পৌষ সংক্রান্তি ঘুড়ি উৎসব বা মকর সংক্রান্তি নামে পরিচিত। সংস্কৃত শব্দ সংক্রান্তি, ঢাকাইয়া অপভ্রংশে সাকরাইন রূপ নিয়েছে। পৌষ ও মাঘ মাসের সন্ধিক্ষণে, পৌষ মাসের শেষদিন সারা ভারতবর্ষে সংক্রান্তি হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। পৌষ সংক্রান্তি বলে যে উৎসব দক্ষিণ এশিয়ায় পালিত হয় তারই ঢাকাইয়া নাম সাকরাইন। এই উৎসবটি বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের আরো কয়েকটা দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পালন করা হয়। যেমন-ভারতে পৌষ সংক্রান্তি নামে, নেপালে মাঘী নামে, থাইল্যান্ডে সংক্রান্ত, থাওসে পি মা লাও, মিয়ানমারে থিং ইয়ান এবং কম্বোডিয়ায় মহাসংক্রান্ত নামে পরিচিত। মকরক্রান্তি হলো সেই ক্ষণ যাকে ঘিরে এ উৎসব পালিত হয়।

বর্তমানে আমাদের দেশের পুরান ঢাকায় পৌষ সংক্রান্তি বা সাকরাইন সার্বজনীন ঢাকাইয়া উৎসবে রূপ নিয়েছে। দিনভর ঘুড়ি উড়ানোর পাশাপাশি সন্ধ্যায় বর্ণিল আতশবাড়ি আর রং-বেরঙের ফানুশে ছেয়ে যায় বুড়িগঙ্গা তীরবর্তী শহরের আকাশ। এক কথায় বলতে গেলে সাকরাইন হচ্ছে ঘুড়ি উৎসব যা বাংলা ক্যালেন্ডারের নবম মাস পৌষের শেষের দিন আয়োজিত হয়। যা গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডারের হিসাব অনুয়ায়ী জানুয়ারি মাসের ১৪ বা ১৫ তারিখে পড়ে। বাংলায় এ দিনটি পৌষ সংক্রান্তি এবং ভারতীয় উপমহাদেশে মকর ক্রান্তি নামে পরিচিত।

বাংলাদেশে প্রাচীন উৎসবগুলোর মধ্যে পুরান ঢাকার সাকরাইন ঘুড়ি উৎসব অন্যতম। বাঙালি সংস্কৃতিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। ঢাকা শহরে উৎসবমুখর পরিবেশে সাকরাইন উৎসব পালন করা হয়। সাকরাইন পৌষ সংক্রান্তি বা ঘুড়ি উৎসব সাধারণত পুরান ঢাকায়

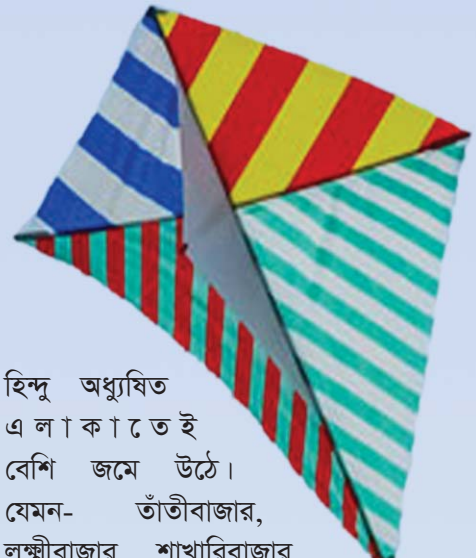

হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাতেই বেশি জমে উঠে। যেমন- তাঁতীবাজার, লক্ষ্মীবাজার, শাখারিবাজার, সূত্রাপুর, গেন্ডারিয়া, লালবাগ এর আশপাশের মানুষ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে মেতে উঠে এ উৎসবে। দুই দিনের উৎসবের ১ম দিন পুরান ঢাকার আকাশ নানা রঙের ঘুড়িতে ছেয়ে যায়। সন্ধ্যায় আকাশ আলোকিত করে ফানুশ। আগে ঘুড়ি উড়াতো মাঠে ঘাটে। এখন ওড়ে ছাদে ছাদে। ঢাকায় এ উৎসব হচ্ছে প্রায় ৪০০ বছর ধরে। বাংলাদেশের পুরান ঢাকায় ঘুড়ি ওড়ানো বিনোদন শুরু হয়েছিল মুঘল আমলে। কথিত আছে ১৭৭০ সালে নবাব নাজিম মহম্মদ খাঁর আমলে ঘুড়ি উৎসবের সূচনা হয়। সেই থেকেই এই ঘুড়ি উৎসব ভারতের পশ্চিম গুজরাটেও পালিত হয়ে আসছে। সেখানে মানুষ সুন্দর সুন্দর ঘুড়ির মাধ্যমে সূর্যদেবতার কাছে নিজেদের আকুতি জানায়। উত্তর ভারতীয় এ ঘুড়ি উৎসবকে স্থানীয়রা সাকরাইন নামে অভিহিত করে।

১৪ই জানুয়ারি পুরান ঢাকার আকাশ থাকে ঘুড়িদের দখলে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে পুরান ঢাকার বাহান্ন রাস্তায় তেপ্পান্ন গলিতে আর খোলা ছাদে চলে সুতা মাঞ্জা দেওয়ার ধুম। আকাশে উড়ে নানা রকমের ঘুড়ি। যেমন- চোখদ্বারা, মালাদ্বার, পঙ্খীরাজ, চশমরদায় কাউঠাদ্বার, চানদ্বার, চাপালিশ, একরঙা এমনকি জাতীয় পতাকার রঙের লাল-সবুজের ঘুড়ি তৈরি করা হয়। এসব ঘুড়ির সাথে ঘুড়ির লেজ যেন আরো বেশি সুন্দর হয়।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা কি জানো অনেক নামের ঘুড়ি আছে। যেমন–

ডায়মন্ড ঘুড়ি : ১৮৫০-এর দশকের মানুষের মধ্যে ডায়মন্ড ঘুড়ি ওড়ানোর প্রচলন ছিল। ডায়মন্ড ঘুড়ি এখনও বিলুপ্ত হয়নি। কোথাও এই ডায়মন্ড ঘুড়ি এডি ঘুড়ি হিসেবে পরিচিত। আধুনিক উপকরণ দিয়ে তৈরি ডায়মন্ড ঘুড়ি।

বার্ণ ডোর ঘুড়ি: এই ধরনের ঘুড়ি বড়ো আকৃতির এবং আকারে আয়তক্ষেত্র। বার্ণ ডোর ঘুড়ি বা আমেরিকান থ্রি স্টিকের উৎপত্তি ১৮০০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে।

ডপিরো ঘুড়ি: ডোপিরো ঘুড়ির দুটি ডানা থাকে কোনো লেজ নেই। এই ঘুড়ি মূলত ছবি তোলার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়।

রোলার ঘুড়ি: রোলার ঘুড়ির লেজের দিকে ডিজাইন কম এটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলে উড়ানোর জন্য কার্যকর। এটি ১৯৩০-এর দশকে থেকে দেখা যায়। তবে তখন এ নকশাটিকে বলা হতো রোলোপ্লান।

স্লেড ঘুড়ি: আমেরিকান উইলিয়াম অ্যালিসন ১৯৬০ -এর দশকে স্লেড ঘুড়ি আবিষ্কার করেন। প্যারাসুটের মতো বায়ুর চাপেই ঘুড়ির আকৃতি বজায় থাকে।

বাক্স ঘুড়ি: বাক্সঘুড়ি দেখতে অবিকল বক্সের মতো। অনেকগুলো বাক্স একসাথে জোড়া লাগিয়ে বানানো হয় এই ঘুড়ি।

অক্টোপাস ঘুড়ি: সমুদ্র সৈকতের দিকে গেলে সবার নজরে পড়ে অক্টোপাস ঘুড়ি। এটি অবিকল অক্টোপাসের মতো দেখতে। বাচ্চারা এই ঘুড়ি খুবই পছন্দ করে।

ডেলটা কাইট বা ঘুড়ি : ডেলটা ঘুড়ি সেরা ঘুড়ি। কখনো কখনো এটিকে স্টান্ট ঘুড়ি বলা হয়। এই ঘুড়িটি গতি ও চক্রের জন্য ডিজাইনের করা হয়েছে। ডেলটা ঘুড়ি খুবই পাতলা বলে অনেক উড়তে পারে।

মুঘল আমল থেকেই আমাদের দেশে বাণিজ্যিকভাবে ঘুড়ি তৈরি শুরু হয়। বাড়ির ছাদে, খোলা মাঠ থেকে আকাশে অনেক ঘুড়ি উড়তে দেখা যায়। ধারণা করা হয় আজ থেকে প্রায় ২ হাজার ৮০০ বছর আগে চীনে ঘুড়ি উড়ানো শুরু হয়। পরবর্তীকালে এটি এশিয়ার অন্যান্য দেশ বাংলাদেশ, ভারত, জাপান এবং কোরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া ইউরোপে প্রায় ১৬শ বছর আগে ঘুড়ি উড়ানো খেলাটির প্রচলন ঘটে।

বাংলাদেশের পুরানো ঢাকায় অনেককাল আগে থেকেই ঘুড়ি উড়ানো প্রতিয়োগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতা হচ্ছে কাটাকাটি ধরনের। এর আয়োজন চলতে থাকে বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই। তারপর নিদিষ্ট দিনে সবাই যার যার নাটাই ঘুড়ি নিয়ে বাড়ির ছাদ বা খোলা মাঠে গিয়ে হাজির হয়। উড়তে থাকে হাজার হাজার ঘুড়ি। চলে একটির সাথে অন্যটির কাটাকাটি খেলা। আস্তে আস্তে কমতে থাকে ঘুড়ির সংখ্যা। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা ঘুড়িটিই বা ঘুড়ির মালিকই হয় বিজয়ী।

আন্তর্জাতিক ঘুড়ি উৎসব

বাংলাদেশে বিশেষ করে পুরনো ঢাকায় পৌষ মাসের শেষ দিন অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তিতে ঘুড়ি উৎসব পালন করা হয়। এছাড়া ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, এবং ইন্দোনেশিয়ার বালি, ইটালির সার্ভিয়া, ডেনমার্কের ফেনো, জাপানের সিরোন, নিউ জার্সির ওয়াল্ডউড অনেক এলাকায় ঘুড়ি উড়ানোর বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবছর ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের আহমেদাবাদ শহরে পালন করা হয় আন্তর্জাতিক ঘুড়ি উৎসব। সাতদিনব্যাপী চলে এ অনুষ্ঠান। গেল বছর ৩১ টি দেশ থেকে আসা নানা বয়সি মানুষ বিভিন্ন নকশায় ১শ ৮০ টি ঘুড়ি নিয়ে হাজির হন আন্তর্জাতিক এ ঘুড়ি উৎসবে। প্রত্যেক বছর আয়োজিত এই ঘুড়ি উৎসবে দর্শকদের মাঝে থাকে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। হিন্দুদের মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে এ ঘুড়ি উৎসব পালন করা হয়।

অজানা তথ্য: সর্বপ্রথম ঘুড়ি উড়ানো হয় আজ থেকে প্রায় ৩ হাজার বছর আগে। তখন ঘুড়ি তৈরি হতো গাছের পাতা থেকে।

● এ পর্যন্ত উড়তে পারা সবচেয়ে ছোটো ঘুড়ির দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৫ মিলিমিটার। এটির নাম জানা নেই।

● পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ঘুড়ির নাম মেগাবাইট। এটির দৈর্ঘ্য ৫৫ মি. প্রস্থ ২২ মিটার।

●পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা ঘুড়ির দৈর্ঘ্য ১ হাজার মিটার বা ৩ হাজার ৩৯৪ ফুট।

● দ্রুতবেগে ওড়া ঘুড়ির দ্রুততা পরিমাপ করা হয়েছে ঘন্টায় ১২০ মাইল।

●বেশি সময় আকাশে থাকা ঘুড়ির সময়কাল ১৮০ ঘণ্টা।

● উঁচুতে যে ঘুড়িটি উড়েছে সেটি পৌছায় ৩ হাজার ৮০১ মিটার পর্যন্ত।

● এক সারিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যাক ঘুড়ি উড়েছে ১১ হাজার ২৮৪টি। রেকর্ডটি দখল করে আছেন জাপানের একজন ঘুড়ি নির্মাতা।

● জাপানে ঘুড়ি ওড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ১৭৬০ সালে। কারণ কর্তৃপক্ষের মনে হয়েছিল মানুষ কাজের চেয়ে ঘুড়ি উড়ানোতে বেশি সময় ব্যয় করেছে। এ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় চীনেও ঘুড়ি উড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়। তখন কেউ ঘুড়ি উড়ালে কারাগারে প্রেরণ করা হতো।

● থাইল্যান্ডে ঘুড়ি উড়ানোর ৭৮টি নিয়ম কানুন আছে।

● যুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ঘুড়ির ব্যবহার হয়েছে বহু শতাব্দী যাবত। প্রাচীনকালে ঘুড়ি দিয়ে মিত্র পক্ষদের সংকেত প্রদান করা হতো। ■

গল্প

মায়াবী ঘুমের গল্প

মোস্তাফিজুল হক

ঝিকঝিক কু ঝিকঝিক ট্রেন চলছে। মনে মনে ভাবছি জামালপুর স্টেশনে পৌঁছাতেই রাত ১টা বাজবে। তারপর আরও এক মাইল পথ। মফস্বল শহর। একটা রিকশাও পাওয়া যাবে না। মূল শহরের বাইরে সড়ক বাতিও নেই। আর গ্রামে তো বিদ্যুতের প্রশ্নই আসে না। সাতপাঁচ ভাবতে আর ভালো লাগছে না। ক্লান্ত শরীর। দুই চোখে মায়াবী ঘুমের হাতছানি। এদিকে কখন বাড়ি পৌঁছে মায়ের মুখ দেখব আর তাঁর হাতের মজার রান্নায় উদরপূর্তি করব, এসব ভেবে স্বস্তি পাচ্ছি না। মা বলেছেন আমি বাড়ি ফিরলেই নতুন চালের পিঠা বানাবেন।

আমি, রুপু ও তপু মতিন স্যারের নেতৃত্বে সাতদিনের জাম্বুরি ক্যাম্প শেষে ফিরছি। মতিন স্যার আমাদের স্কুলের শরীর চর্চার শিক্ষক। যখন কমলাপুর স্টেশনে এসে পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা। একমাত্র যমুনা মেইল ট্রেন ছাড়া আর কোনো ট্রেন নেই। সাড়ে ৭টায় ছেড়ে যায়। কখনো কখনো সিডিউল ঠিক থাকে না। কী আর করা। মতিন স্যার টিকিট কেটে ফেললেন। স্যারের এক বন্ধুসহ আমরা পাঁচ সদস্যের দল। চার সিটে ভাগাভাগি করে বসলাম। ট্রেন ছাড়ল দেড়ঘণ্টা লেটে। গত পরশু একটা ভূত সমগ্র কিনেছি। অন্যেরা স্যারের সাথে কথা বলে সময় কাটালেও আমি বেঞ্চে বসে সদ্য কেনা বইটা পড়েই সময় কাটিয়ে দিলাম।

মা ডেকে বলছেন,

এই যে অপু, গরম গরম তেলের পিঠা ভাজছি আর তুই একা একা ঘরে কী করছিস?

কিছু না মা, রেডিও শুনছি। দুর্বার অনুষ্ঠানে নাটক প্রচার হচ্ছে, মা।

আয়, রান্নাঘরে আয়। তেলের পিঠা খাবি।

আসছি মা, বলেই রান্নাঘরে ছুটে গেলাম। মার পাশে বসে মায়ের হাতের গরম তেলের পিঠা খাওয়ার মজাই আলাদা। প্রায় তিন চারটে পিঠা খেয়েছি, এমন সময় দেখি কে যেন এগিয়ে আসছে। বললাম কে?

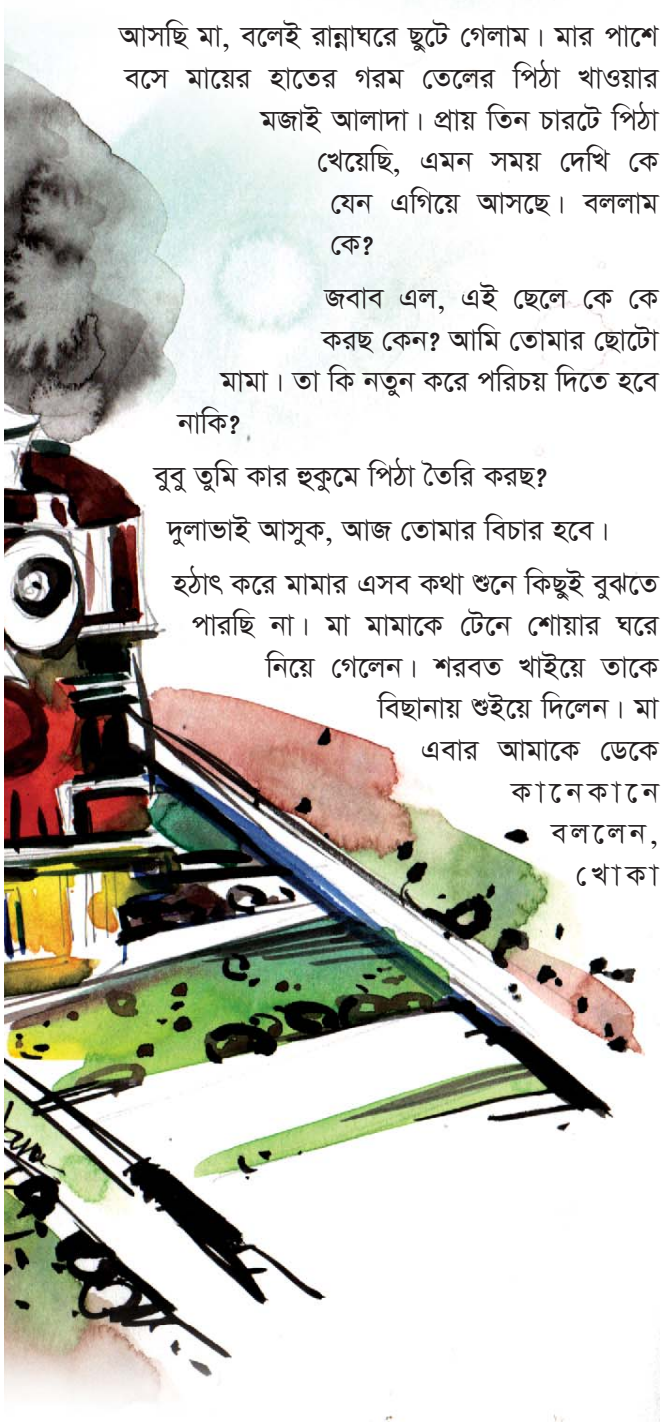

জবাব এল, এই ছেলে কে কে করছ কেন? আমি তোমার ছোটো মামা। তা কি নতুন করে পরিচয় দিতে হবে নাকি?

বুবু তুমি কার হুকুমে পিঠা তৈরি করছ?

দুলাভাই আসুক, আজ তোমার বিচার হবে।

হঠাৎ করে মামার এসব কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারছি না। মা মামাকে টেনে শোয়ার ঘরে নিয়ে গেলেন। শরবত খাইয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মা এবার আমাকে ডেকে কানেকানে বললেন, খোকা শোন, তোর মামা আজ দু-বছর যাবৎ সিজোনাল পাগল। শীত আসলেই পাগল হয়ে যায়। তাই শরবতের সাথে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছি। একটু ঘুমাক। ভালো মতন একটু ঘুম হলেই ঠিক হয়ে যাবে। ভাগ্যিস তোর আব্বার একটা ঘুমের বড়ি ছিল।

কিন্তু মামা যে পাগল হয়েছেন, তা তো জানি না মা?

ভয় পাস যদি, তাই তোদেরকে জানানো হয়নি। তোর বন্ধু মনা আর হাসুকে ডেকে নিয়ে আয়। খালি বাড়ি। তুই তো আর একা পাগলটাকে সামলাতে পারবি না। রাতে যদি আবার পাগলামি বাড়ে। বলা তো যায় না? ওরা আজ এ বাড়িতেই থাকবে। তাছাড়া তুই তো ওদেরকে পিঠার দাওয়াতও দিয়েছিলি।

কথামতো আমি ১৫-২০ বাড়ি দূরে মনাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সঙ্গে হারিকেন বা টর্চ কিছুই নিলাম না। কারণ, আকাশে আধেকটা ছিঁড়ে খাওয়া রুটির মতো চাঁদ উঠেছে। তাতেই চারদিকে মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং ভয় কিসের?

বাড়ির সম্মুখের গোরস্থান পেরিয়ে যাবার সময় তবু কেন জানি গা ছমছম করে উঠল। পরক্ষণেই স্বাভাবিক উদ্যম নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। বড়ো রাস্তা পেরিয়ে মনাদের বাড়ির রাস্তায় উঠলাম। চারিদিকে সুনসান নীরবতা। রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা। হালকা শীতের আমেজ। গ্রামের প্রায় প্রতিটা পরিবার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। শিক্ষার হার কম থাকলে যা হয় আর কি। তাছাড়া গেরস্ত পরিবার, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি হয়েছে। ভোরেই আবার মাঠে ছুটতে হবে যে। তাই হয় তো এরা দ্রুতই ঘুমাতে যায়।

মনে মনে নানা কথা ভাবতে ভাবতে বড়ো দীঘির পাড়ে এসে গেছি। দিঘির দক্ষিণ পাড়ে বিশাল বাঁশঝাড়। এমন সময় হঠাৎ করে শোঁ শোঁ শব্দে ভীষণ ঝড় উঠল। বাড়িঘরও প্রায় দুশো গজ দূরে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম আশেপাশে কোথাও ঝড় নেই। তাহলে এখানে হঠাৎ এত কিসের ঝড়!

ভয়ে আবারো গা ছমছম করে উঠল!

হঠাৎ সম্মুখে তাকিয়ে দেখি রাস্তার উপরে একগোছা

বাঁশ নুয়ে পড়ল! একেবারে রাস্তা এপার-ওপার করে! একপাশে দীঘি আর অন্যপাশে ডোবা। রাস্তা পার হওয়ার কোনো জো নেই! এমন সময় মনে পড়ল দুষ্টু ভূতেরা বাঁশ হয়ে শুয়ে পড়ে। বাঁশ ডিঙাতে গেলে নাকি আঁছড়ে ফেলে পথচারীকে মেরে ফেলে! আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠেছে! ভয়ে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেছে!

গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছে না। মনে মনে দোয়া-দরুদ পড়ছি। শুনেছি পেছনেও ফেরা যায় না। তাহলে ভূত চেপে বসে। কী বিপদ! সামনে যে আরো একটা বড়ো বাঁশের ঝাড় আছে। ওটা ক্যামনে পার হব? ভয় যেন আরো বেড়ে যাচ্ছে।

মিনিট পাঁচেক হয়ে গেছে। এ কি! হঠাৎ বাঁশগুলো আপনা-আপনিই উঠে গেল!

যাক, বেঁচে গেলাম। আবার সামনে হাঁটা শুরু করলাম। আর কোথাও কোনো সমস্যা হলো না।

মনাদের বাড়িতে পৌঁছতেই মনার মা বলে উঠলেন,

অপু, তোমার কী হইছে? চুলগুলা এত খাড়া ক্যান? শরীরে যে জাড়কাঁটা দিছে !

আমি সবকিছু খুলে বললাম। এসব শুনে তিনি আমাকে বিচিকলা খাওয়ালেন। প্রথম আমন ধান কাটা পড়েছে। হাঁড়িতে খড়ের আগুনে ধান সিদ্ধ করছিলেন। ধানের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে পানি গরম দিলেন। পানি গরম হলে তা পান করালেন। আর বললেন,

লোহা পুড়ে ছ্যাঁক দিলে ভূতের কু-দৃষ্টি কেটে যাবে। আর কোনো বালাই থাকবে না।

আমি বললাম, না গো খালা ঠুসা পড়বে। ছ্যাঁক দেওন লাগত না। আমার ভয় কেটে গেছে।

কখন জানি তবুও তিনি লোহার বেড়িকাঁঠি গরম দিয়ে রেখেছিলেন।

হঠাৎ করেই আমার হাতে ছ্যাঁকা দিলেন।

আমি চিৎকার দিয়ে উঠলামও মা গো...

এমন সময় যা শুনলাম,

এই যে অপু, কী হয়েছে? উঠ, নেমে পড়ি। ট্রেন জামালপুর স্টেশনে এসে পড়েছে। মতিন স্যারের কথা শুনে আমি কিছুটা সময় হাবাগোবার মতো তাকিয়ে রইলাম।

এরপর বিষয় পরিষ্কার হতেই মনে হলো, গত দুদিন ভূত সমগ্র পড়ায় মনের গভীরে ভূত বিষয়ে যে কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে তারই ফলাফল এটা। ■

বাংলাদেশের কাঠের তৈরি মসজিদ

বাদল রহমান

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার উদয়তারা বুড়িরচর গ্রামে রয়েছে মমিন জামে মসজিদ নামে বাংলাদেশের একমাত্র কাঠের তৈরি স্থাপনা। দুইশত বছরের পুরনো মসজিদটি শৈল্পিক কারুকাজে সমৃদ্ধ কাঠ দিয়ে তৈরি। এটিই বাংলাদেশের একমাত্র কাঠের মসজিদ হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাঠের মসজিদটি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম মসজিদের ২৩তম স্থান দখল করে আছে। ইউনিসেফ প্রকাশিত বিশ্বের অন্যতম মসজিদ নিয়ে ৪০০ পৃষ্ঠার একটি বইয়ে এই মসজিদটির সচিত্র বর্ণনা আছে। এটি দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র কাঠের তৈরি কারুকাঠ ও ক্যালিওগ্রাফি সমৃদ্ধ দৃষ্টিনন্দন মুসলিম স্থাপত্যকলার একটি নিদর্শন।

ফরায়েজি আন্দোলনের অন্যতম নেতা মরহুম মৌলভি মমিন উদ্দিন আকনের একান্ত প্রচেষ্টায় মসজিদটি নির্মিত হয়। মমিন উদ্দিন আকন ২১ জন কারিগর কাঠ-খোদাই মিস্ত্রি নিয়ে ১৯১৩ সাল থেকে কাজ শুরু করেন। শাল, সেগুন ও লোহা কাঠ ব্যবহার করে লোহাবিহীন এই অপূর্ব শিল্পকর্মটির কাজ ১৯২০ সালে শেষ করেন। এটি ১৬ হাত দৈর্ঘ্য, ১২ হাত প্রস্থ ও ১৫ হাত উচ্চতা বিশিষ্ট। এর চারপাশের বেড়া তিনটি অংশে বিভক্ত উপরে ও নিচে কাঠের কারুকাজ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে দুটি পার্ট দিয়ে ডাবল বেড়া। ভিতরে একরকম ও বাইরে অন্যরকম। ভিতরের কারুকাজ করা বেড়াটি খুলে আলাদা করা যায়। ইট দিয়ে নির্মিত অনুচ্চ নিরেট মঞ্চের ওপর আয়তাকার পরিকল্পনায় কাঠের জোড়াবদ্ধ বেড়া ও খুঁটি সমর্থিত টিনের আটচালা ছাউনি বসিয়ে স্বল্প পরিসরে মমিন মসজিদ নির্মিত হয়েছে। কাঠের বেড়ার মধ্যে আকর্ষণীয় কারুকাজ বিধৃত হয়েছে। সে কারুকাজের মটিফে ঠাঁই পেয়েছে জ্যামিতিক বিন্যাসে ক্ষুদ্রাকার ফোকর, বরফি, ফুলদানি, স্টাইলিশ কলিসহ বিরুদের ডাঁটা, নাস্তালিক ক্যালিগ্রাফি প্রভৃতি।

ওই গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িই তখন কাঠের তৈরি। এ ছাড়া গ্রামটি ছিল বিভিন্ন কাঠ ও ফলগাছে পরিপূর্ণ। এ কারণে তিনি মসজিদটি বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা, ফুল ও আনারসের মতো ফলের ডিজাইনে করার পরিকল্পনা করেন। দুষ্প্রাপ্য লোহাকাঠ ও বার্মা সেগুনকাঠের ওপর এসব ডিজাইনে ব্যবহার করা হয় প্রাকৃতিক রং। যুবক মমিন উদ্দিন আকন তার আরবি ভাষা, ইসলামিক সংস্কৃতি ও ক্যালিওগ্রাফির জ্ঞানকে এক্ষেত্রে কাজে লাগান। মসজিদের প্রবেশদ্বারে একটি এবং মেহরাবে একটি ক্যালিওগ্রাফির নকশা বসানো হয়। ■

নিবন্ধ

বাদুড় রহস্য

সৈয়দা নাদিয়া হক

তুমি কি কখনো বাদুড়কে ভেংচি কেটেছ? খবরদার!! এমন ভুল কখনো করো না। হয়ত ভাবছ বাদুড় চোখে দেখে না কিন্তু তারা দিব্যি চোখে দেখে। অবাক করা বিষয় হলো, কিছু প্রজাতির বাদুড়ের দৃষ্টিশক্তি মানুষের চেয়েও বেশি। ২০০৯ সালে প্লাস ওয়ানে প্রকাশিত একটি জার্নালে বলা হয়েছে, দক্ষিণ আমেরিকার 'Glossophaga Soricina' এবং মধ্য আমেরিকার 'Carollia perspicillata' নামক বাদুড়-এর দিনে রং শনাক্তের রিসেপটর আছে। ফলে সে আলট্রাভায়লেট আলো দেখতে পায় এবং মানুষের দৃষ্টিশক্তির বাহিরে থাকা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো দেখে। তুমি কী জানো? পৃথিবীতে তালিকাভুক্ত স্তন্যপায়ী প্রজাতির ২০ শতাংশ বাদুড়। স্তন্যপায়ী প্রাণিদের চোখের রেটিনায় দুই ধরণের আলোকগ্রাহী কোষ থাকে। দিনের আলোয় রং দেখার জন্য প্রয়োজন 'কোন' নামক কোষ। লক্ষ করে থাকবে জোছনার মৃদু আলোতে আমরা আবছা ভাবে সবকিছু দেখতে পেলেও তাদের রঙ শনাক্ত করতে পারি না। তখন আমাদের চোখের 'রড' জাতীয় কোষ কাজ করে। এরা অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং অল্প আলোতে কাজ করে। বাদুড়ের চোখে দুইটি কোষই বিদ্যমান।

এক সময় ধারণা করা হতো বাদুড় চোখে দেখে না ফলে ইকো-লোকেশন ব্যাবহার করে চলাচল করে। কথাটি সত্য নয়। আসলে বাদুড় মশাই বেশ সচেতন এক প্রাণী। চলার সময় চোখে দেখে এবং একই সাথে ইকো-লোকেশনও ব্যাবহার করে। শিকারের ক্ষেত্রে ইকো-লোকেশন বেশ সহায়তা করে। ব্যাট কনজার্ভেশন ইন্টারনেশনালের তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে কমপক্ষে ১৩০০ প্রজাতির বাদুড় আছে। ৭০ ভাগ বাদুড় পতঙ্গভুক, বাকিরা ফল ও ফুল খায়। জানা যায়, এদের মধ্যে তিনটি প্রজাতি রক্ত খায়। তারা আমেরিকায় থাকে।

আচ্ছা ইকোলোকেশন বিষয়টা কী, জানো তো? বাদুড় ওড়ার সময় শব্দের প্রতিধ্বনি ব্যাবহার করে।

ওড়ার সময় তার কণ্ঠ থেকে শব্দ তৈরি করে, সামনে কোনো কিছু থাকলে শব্দটি সেখানে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে, কতক্ষণ পর শব্দটি ফিরে এসেছে সেখান থেকে তারা দূরত্ব অনুমান করতে পারে। এজন্য অন্ধকারে কোথাও ধাক্কা না খেয়ে উড়ে যেতে পারে। তবে বাদুড়ের তৈরি এই শব্দ আমরা শুনতে পাব না কারণ এটি আল্ট্রাসাউন্ড অর্থাৎ ২০,০০০ Hz-এর বেশি। বাদুড় প্রায় ১০০ kHz কম্পাংকের শব্দ তৈরি করতে পারে। পৃথিবীর একমাত্র উড্ডয়ন ক্ষমতা বিশিষ্ট এই স্তন্যপায়ী প্রাণী, পরিবেশের জন্য খুব উপকারী। প্রকৃতির যেসব প্রাণী বীজ ছড়িয়ে রেইন ফরেস্ট নতুন করে গড়ে তোলে তাদের মধ্যে অন্যতম বাদুড়। ■

দশম শ্রেণি, সানারপাড় শেখ মোরতোজা আলী উচ্চ বিদ্যালয়, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

বন্ধু তিতলি

কাজী তাবাসসুম আহমেদ

বন্ধু! হ্যাঁ... স্কুলে কিংবা এলাকায় তোমাদেরতো অনেক বন্ধু আছে তাইনা?

তেমনি একজন বন্ধু হচ্ছে তিতলি। মিষ্টি নাম তাইনা বলো! তিতলি নামের মিষ্টি বন্ধুটা কিন্তু অনেক ভালো।

আচ্ছা তোমরা কী জানো কিভাবে দ্রুত বড়ো হওয়া যায়? জীবনে বড়ো হতে গেলে কিন্তু অবশ্যই ভালো মানুষ হতে হবে। তবে দ্রুত বড়ো হবার জন্য ম্যাজিক আছে। না না! আমি ম্যাজিক জানিনা। ম্যাজিকটা জানে তিতলি!

চলো তাহলে জেনে নিই তিতলি বড়ো হবার জন্য কী কী ম্যাজিক শিখাবে...

১. বাড়ির পাশের ফাঁকা জায়গাটুকুতে গাছ লাগাব এবং পরিচর্যা করব! সবুজের দিকে তাকিয়ে বুকভরে নিঃশ্বাস নাও দেখবে মন ভালো লাগছে।

২. মা একা একা সারাদিন কতো কাজ করেন। মায়ের কাজে সাহায্য করব।

৩. অনেক অনেক বই পড়ব। বই না পড়লে জানবো কী করে পৃথিবীটা কত্তো সুন্দর!

৪. দাদা-দাদু কিংবা বাড়িতে থাকা বড়োদের সঙ্গে গল্প করব। বড়োদের কাছে কিন্তু অনেক অনেক গল্পের ঝুলি আছে। তাই সুযোগ বুঝে গল্পগুলো জেনে নাও।

৫. এই যে শুধু ঘুরে বেড়ালেই চলবে? তুমি যে একজন ভালো মানুষ সেটাওতো প্রমাণ করতে হবে। তাহলে ঝটপট নিজের জিনিসগুলো গুছিয়ে ফেলো!

কী ভালো মানুষ হওয়া সহজ না? তাহলে আজই কাজে লেগে পড়।

এতে করে পাবে বড়োদের অনেক অনেক আদর! বলা যায় না অনেক চকলেট, পুতুল আর গিফটও পাওয়া যেতে পারে। ■

গল্প

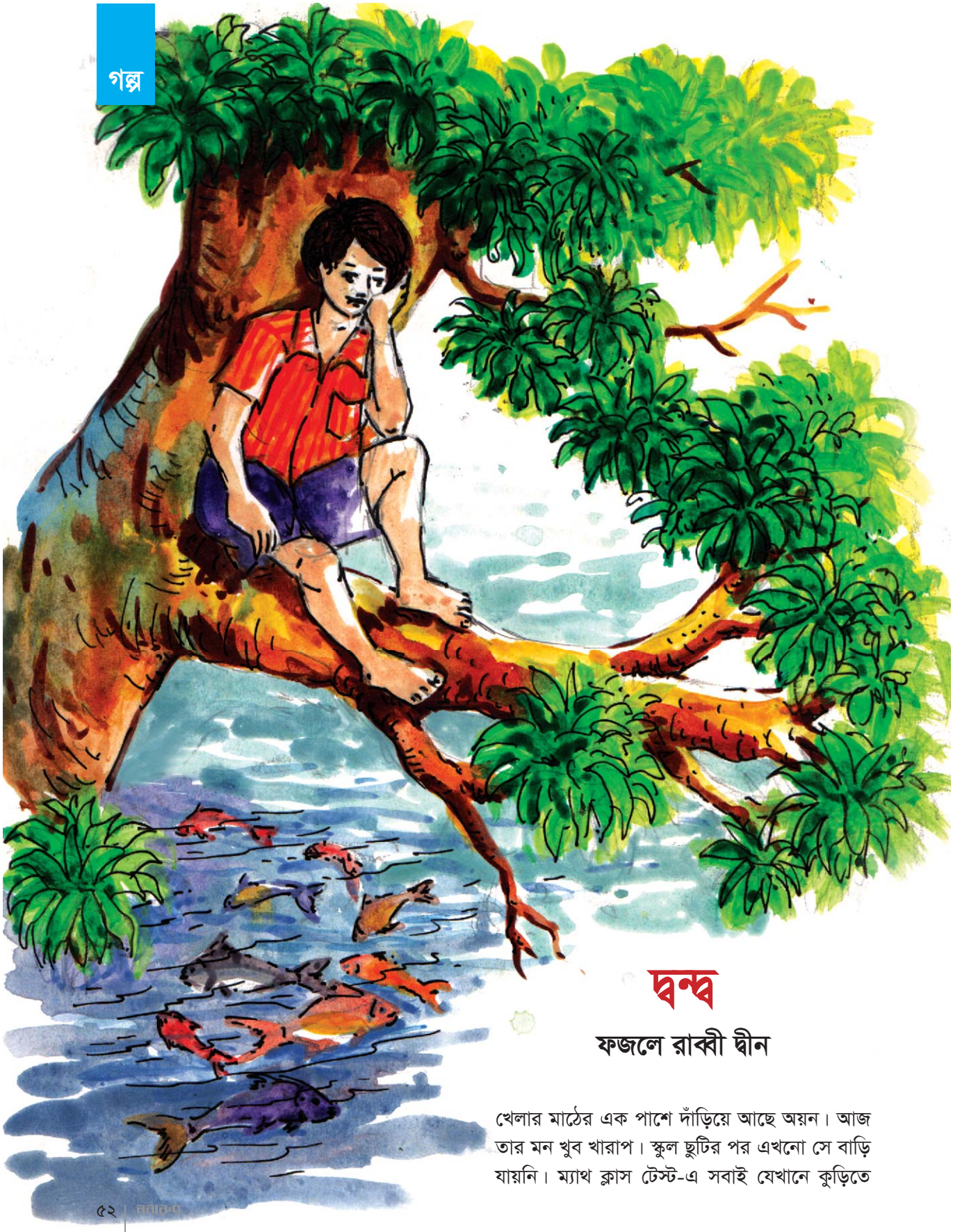

দ্বন্দ্ব

ফজলে রাব্বী দ্বীন

খেলার মাঠের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে অয়ন। আজ তার মন খুব খারাপ। স্কুল ছুটির পর এখনো সে বাড়ি যায়নি। ম্যাথ ক্লাস টেস্ট-এ সবাই যেখানে কুড়িতে

কুড়ি পেয়েছে সেখানে ও পেয়েছে মাত্র দুই। শিপন স্যারের একটা বকাও মাটিতে পরেনি। এ নিয়ে দশের ঘর ছাড়ালো ম্যাথ না মিলাতে পেরে আরো যে কতদিন ঝাড়ি খেতে হবে কে জানে! এখন বাড়িতে যেতেও ভয় লাগছে। এদিকে রতনের সাথেও তার হয়েছে তুমুল ঝগড়া। গত ক্লাসে রতন ঠাট্টা করে হেসেছিল বলে অয়ন তার খাতার পাতা ছিঁড়ে দিয়েছিল। আর তাতে রতন আরো খ্যাপে যায়। দু'জন দু'জনার শার্ট তো ছিঁড়লই আবার প্যান্ট ধরেও টানাটানি শুরু হয়েছিল। শেষমেষ রফিক স্যার এসে এই দুইজনকে সবার সামনে কান ধরিয়ে পঞ্চাশবার উঠবস করিয়ে তবেই মুক্তি দিয়েছিলেন। স্যার না থাকলে সেদিন হয়ত দু'জনের স্কুল ব্যাগ দুটোরও অস্তিত্ব থাকত না। মা অবশ্য সেই ব্যাপারে জেনেছিলেন। কানে হাত গেলেই এখনো ব্যাথাটা অনুভব হয়। বাবা জানলে স্কুলে যাওয়াই বন্ধ করে দিতো আর বলতো, 'অনেক কিছু করেছ বাবা, আর স্কুলে গিয়ে কাম নেই। এই যে কাঁচি নাও আর মাঠে গিয়ে বলদের জন্য এক বস্তা ঘাস কেটে নিয়ে আস।' অথবা এত কিছু না বলে সরাসরি মুখ ফসকে বলে দিতে পারেন, 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্তই।'

বিকেলের পাখিরা তখনো ঘরে ফেরেনি। পাখিদের মধ্যেও হয়ত বা দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। তা না হলে বাঁশঝাড়ে বসে এত কেন চিৎকার-চেঁচামেচি করে! ঝগড়া কি তাদের ঘরে ফেরার সুখ দেয়? অয়নের ভাবনার মাঝে কে যেন তার মাথায় নিঃশব্দে একটা টোকা দিল। অয়ন চমকে উঠে পেছনে তাকাল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। অথচ অয়নের ভুল হবার কথা নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেকটা টোকা। এবার অয়ন থামল না। আশেপাশে খুঁজে হঠাৎ আমগাছের উপরে চোখ গেল। একি! কচি বয়সের দুরন্ত একটা ছেলে আমগাছের ডালে উপুড় হয়ে ঝুলে আছে। অয়ন ভয় পেয়ে গেল।

'এই তুমি ওখানে কী করছ? পড়ে যাবে তো। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসো।' অয়ন কথাটা বলতে না বলতেই ছেলেটা গাছের ডাল থেকে হাত ছেড়ে দিল। আর অমনি ধপাস করে মাটিতে পড়ল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠে দাঁড়িয়ে অয়নের সামনে এসে বলল, আমি যখন তোমার মাথায় টোকা দিয়েছিলাম, তখন তুমি ভয় পেয়েছিলে, তাই না?'

অয়ন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'না, পাইনি।'

'কেন পাওনি?'

'জানি না, তার আগে বলো তুমি গাছ থেকে ওই ভাবে হাত ছেড়ে দিলে কেন? যদি ব্যথা পেতে? পা দুটি যদি ভেঙে যেত তখন কি করতে?'

'ও, তার মানে তুমি আমার পা ভাঙা নিয়ে চিন্তিত ছিলে, এক কথায় অয়ন ভয় পেয়েছিল।'

অয়ন চমকে উঠে বলল, 'তুমি আমার নাম জানলে কী করে?'

'আমি শুধু নাম না, তোমার সবকিছুই জানি। তুমি আজ ক্লাসে তোমার নিজের নাম লিখতে ভুল করেছিলে। 'অয়ন' না লিখে লিখেছিলে 'অযন'। স্যার যখন তোমায় বকা দিচ্ছিল তখন আমি বাইরে ডাব গাছের মাথায় বসে পানি খাচ্ছিলাম আর হাসতে হাসতে গাছ থেকে পড়েও গিয়েছিলাম। এই যে দেখো আমার পা-টা ভাঙা।' এই বলে ছেলেটা নিচু হয়ে তার পা-টাকে টান দিয়ে খুলে অয়নের সামনে মেলে ধরল। আকাশে যেন অমনি বিজলি চমকে উঠল। অয়ন আর ঠিক থ াকতে পারল না। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

অয়নের যখন জ্ঞান ফিরে তখন সে নিজেকে নদীর ঠিক মাঝখানে নৌকার মাঝে পড়ে থাকতে দেখল। তখন চারদিকে বাতাস হু হু করে বইছে। নদীতে ঢেউ ফুলে ফেঁপে উঠছে। আর সেই ঢেউয়ে নৌকা দুলছে আপন মনে। তার মাথার কাছেই বৈঠা হাতে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অদ্ভুত ছেলেটা। অয়ন কাঁচুমাচু করে বলল, 'তুমি কে?'

'ডাহুক, আমায় তুমি ভয় পেয়ো না। আমার জন্মের সময় আমাকে দেখতে নাকি ডাহুক পাখির মতো লাগত, তাই মা আদর করে আমার নাম রেখেছে ডাহুক। আমি তোমার মতো মানুষ না হলেও ভালো একজন বাচ্চা ভূত। আর আমার এখনও সবগুলো দাঁত গজিয়ে উঠেনি। এই যে দেখো..।' - ডাহুক তার

পঁয়তাল্লিশটা দাঁত অয়নকে দেখিয়ে আবার বলল, 'বয়সটা যদিও বিশ এর ঘর ছাড়ায়নি তবে মা বলেছে আমি নাকি পেকে গেছি। তাই আমার ফিটার খাওয়া বারণ করে দিয়েছে।'

'কিন্তু তুমি কোথায় থাকো? আর এখানে কেন? আমার সাথে তোমার কী কাজ?' - বলল অয়ন।

'আমরা তোমাদের এই গ্রামেই থাকতাম। ঐ যে ছোটো দিঘিটা দেখতে পাচ্ছ তার ঠিক পাশেই আমগাছটার মাথায়। তোমাদের এই মাঠেই আমরা খেলতাম। কিন্তু তোমার বাবা ও কাকু একদিন...' - বলতে বলতেই থেমে গেল ডাহুক।

'আমার বাবা ও কাকু তোমাদের কী করেছে?'

'আমাদের অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দিয়েছে।'

'কী বলছ তুমি? এটা কীভাবে সম্ভব? আর তারা এ কাজ কেন-ই বা করতে যাবে?'

'জিদ। সবকিছু জিদের কারণে করেছে। পৌষ মাসের শেষদিকে তোমার বাবা একদিন পালং তৈরির জন্য আম গাছটার পাশের জামগাছটা কেটে ফেলে। আর তাই দেখে তোমার কাকু পর দিন আমাদের থাকার প্রিয় আমগাছটাকেই টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে।'

'হুম। আমি এটা জানি। এ নিয়ে উনাদের মাঝে অনেক দিন যাবৎ ঝগড়া করতেও দেখেছিলাম।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল অয়ন।

'শুধু এইটুকুতে থেমে থাকলে হয়ত বা এতটা কষ্ট পেতাম না। আমরা আমাদের ঘর হারানোর পর দিঘির পূর্ব পাশটায় চলে যাই। ভিটেমাটি হারিয়ে লতাপাতা খেয়ে বাঁচতে শুরু করি। ওখানে ছোটো জাম্বুরা গাছের মাথায় নানুদের সাথে ঘর বাঁধি। কিন্তু ভূতের ভিড়ে গাছটা এতটাই হেলে পড়েছিল যে কখন যে ভেঙে মাটিতে পড়ি আর কোমড় ভাঙি তা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। চিন্তাটা অবশ্য ভুল ছিল না। একদিন পরেই তা বুঝতে পারি। রাত পোহাবার আগেই দেখি গাছের ডাল ভেঙে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছি। নানুর পা দু'টো খোলা আসমানে আর মাথাটা কিঞ্চিৎ মাটির ভেতর। সবার চেঁচামেচি ও কান্নার রোল শুনে বুঝতে পারি তিনি আর পৃথিবীতে নেই। মনের দুঃখে বাবা-মাকে নিয়ে তোমাদের বাড়ির পাশেই গম-ক্ষেতের ঝোপে ইঁদুরের মতো বাঁচতে শুরু করি। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! চৈত্রের শেষ প্রহরে ঝোপের মধ্যে কোথা থেকে যেন উড়ে এসে লাগল আগুন। তাতে গম-ক্ষেত তো পুড়ল পুড়লই, আমার বাপটাকেও ছাই বানিয়ে নিয়ে গেল। অবশ্য খানিক পরেই বুঝতে পারি এই কাজটা কে করেছে!'

'কে করেছিল?'- রাগত স্বরে বলল অয়ন।

'তোমার কাকু। তোমার কাকুর আমগাছটা কেটে ফেলার পর থেকেই এই সব কাণ্ড-লীলা আরো দ্বিগুণ হারে বেড়ে যায়। তোমার বাবা কোনো কথা না বলে বাগান থেকে মিষ্টি বরই গাছটা রাতের অন্ধকারে কেটে দিঘির জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। তোমার কাকু এতে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে। এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে দিল তাতে তার বুক কাঁপল না একটুকুও। ভাই ভাই যুদ্ধে শুধু কপাল পুড়ল আমার।' ডাহুক কথাগুলো বলতে বলতে হু হু করে কেঁদে উঠল।

'তোমার কি প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করেনি?' অয়ন বলল।

'ইচ্ছে করেছিল। মনে হচ্ছিল যেন সেই মুহূর্তেই তোমার বাবা ও তোমার কাকুর ঘাড় মটকে দিয়ে আসি। কিন্তু পারিনি।'

'কেন?'

'তোমাদের দিকে তাকিয়ে। তোমরা ভাইবোনেরা আমার মতো বাবা হারা হয়ে যাবে, এই ভেবে।

অয়ন ড্যাবড্যাব করে কেবল তাকিয়ে আছে ডাহুকের দিকে। শরীরে তার হালকা কাঁপুনি। মনে হচ্ছে নৌকা থেকে ছিটকে পড়ে যাবে পানিতে।

'এখন তুমি কী করবে?' নিচু স্বরে কথাটা বলে ফেলল অয়ন।

'চলে যাব। অনেক দূরে চলে যাব।' ■

আইমানের অ্যাপ

নওশের আলম

আইমান আল আনাম। মাত্র ক'দিন আগেই পা দিয়েছে ১০ বছরে। বর্তমানে চট্টগ্রামের সাউথপয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছে। সম্প্রতি সে যোগাযোগের নতুন একটি অ্যাপলিকেশন (অ্যাপ) তৈরি করে সবাইকে চমকে দিয়েছে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সেই খবর পৌঁছে গেছে বহির্বিশ্বেও। প্রবল আগ্রহের পাশাপাশি ইন্টারনেটের জ্ঞানভাণ্ডার ও ইউটিউবকে কাজে লাগিয়ে এই অসাধ্য সাধন করেছে আইমান। বর্তমানে ইন্টারনেটভিত্তিক কল, ভিডিও ও চ্যাটের জন্য ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার কিংবা ভাইবার বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু সবগুলোই তৈরি করেছেন বাইরের দেশের মানুষ। 'প্রযুক্তির এই যুগে আমরা কেন বাইরের কারও তৈরি অ্যাপ ব্যবহার করব' একদিন তার মনে জাগে এই প্রশ্ন। সেই জেদ থেকেই ২০১৯ সালের মার্চ মাস থেকে আইমান নেমে পড়ে অ্যাপ তৈরিতে। একসময় একটা টিউটোরিয়ালে অ্যানড্রয়েড স্টুডিওর ব্যাপারে জানতে পারে। পরে ওটার মাধ্যমেই অ্যাপসটা তৈরি করে আইমান। এই কাজে আইমানকে আরো সহযোগিতা করেছে ইউটিউবের বিভিন্ন ভিডিও টিউটোরিয়াল এবং ইন্টারনেটের তথ্য তার সেই প্রচেষ্টা পরিপূর্ণতা পায় ২৭শে ডিসেম্বরে। আইমান তার তৈরি এ অ্যাপের নাম দিয়েছে মায়ের নামে। মা লিটা আকতারের নামের প্রথম অংশ নিয়ে তার অ্যাপের নাম রেখেছে 'লিটা ফ্রি ভিডিও কলস অ্যান্ড চ্যাট' এই কাজে অ্যাপ তৈরির পর সেটা কীভাবে সবার কাছে পৌঁছানো যাবে সেটা নিয়েও চিন্তা করছিল আইমান। সহজে উত্তরও পেয়ে গেল। গুগল প্লে স্টোর! সাহায্য নেয় অনলাইনের। গতবছরের ২৭ ডিসেম্বর অ্যাপ তৈরির কাজ শেষ হলে সেটা পাঠিয়ে দেয় গুগল কর্তৃপক্ষের কাছে। গুগল কর্তৃপক্ষ সবকিছু যাচাই-বাছাই করে গত ৩১শে ডিসেম্বর মেইল করে। প্রথম মেইলে গুগল কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের খবরটা না থাকায় কিছুটা হতাশ হয়ে যায়। তবে মেইলটার নিচে লেখা থাকে 'নিউ ইনফরমেশনস আর অ্যাভেইলেবল'।

সেখানে ক্লিক করতেই চোখের সামনে ভেসে আসে গুগলের অভিনন্দন বার্তা। বর্তমানে ভিডিও ও অডিও কলের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় অ্যাপের মাধ্যমে ভিডিও কলে কথা বলার সময় কিন্তু ছবির মান খুব একটা ভালো থাকে না। ইন্টারনেট সংযোগ দুর্বল হলে তো কলই কানেক্ট হয় না এসব অ্যাপের মাধ্যমে। কিন্তু 'লিটা ফ্রি ভিডিও কলস অ্যান্ড চ্যাট' এর মাধ্যমে ভিডিও কলে কথা বলার সময় ভিডিও চিত্র থাকবে স্পষ্ট, এবং এটি এইচডি (হাইডেফিনেশন) মানের। আর এই অ্যাপটি দুর্বল নেটওয়ার্কেও স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে। এছাড়াও 'লিটা ফ্রি ভিডিও কলস অ্যান্ড চ্যাট' অ্যাপের মাধ্যমে যে-কোনো মাপের ফাইল পাঠানো যায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। খুশির সংবাদ হলো ইতোমধ্যে গুগল প্লে-স্টোর থেকে অ্যাপটি প্রায় ৩০ হাজার ব্যবহারকারী ডাউনলোড করেছে। গুগল কর্তৃপক্ষ 'লিটা ফ্রি ভিডিও কলস অ্যান্ড চ্যাট' নামেই গুগল প্লে-স্টোরে আপলোড করেছে অ্যাপটি। অ্যাপটির বর্ণনায় 'অ্যাপ ক্রিয়েটেড বাই আইমান আল আনাম' লেখা আছে।

কম্পিউটার কিংবা প্রোগ্রামিং আইমানের সমস্ত ধ্যান-জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। পাশাপাশি ক্রিকেট প্রীতিও কিন্তু আছে। পড়ালেখার পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরো কিছু অ্যাপ তৈরি করার ইচ্ছা তার রয়েছে। আইমান বড়ো হয়ে একজন আইটি বিশেষজ্ঞ হতে চায়। যা কিনা কোনো না কোনোভাবে মানুষের উপকারে আসবে। কোডিং আর খেলাধুলার পাশাপাশি কিন্তু সাইমানের ছোট্ট একটা শখও হলো বাগান করা। বাসার বেলকনিতে ছোটখাটো একটা বাগান আছে আইমানের। ভবিষ্যতে এই বাগানটার পরিসর বাড়াতে চায়। ■

শিশুদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আনন্দমুখর দিন

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

শীতের সিগ্ধ সকালে গণভবনে সবুজ-শ্যামল মাঠে আনন্দে মেতেছিল স্কুল-মাদ্রাসার ছোট্ট শিশুরা। এই শিশুদের সাথে সহপাঠীর মতো খেলায় মেতেছিলেন টানা তিনবারের বিজয়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কখনো তাদের বুকে নিয়ে আদর করছিলেন, কখনো আবার দোলনায় বসিয়ে দোল খাওয়াচ্ছিলেন। শিশুরাও সরকার প্রধানের এমন স্নেহমাখা সঙ্গ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। স্বভাবসলুভ আচরণ থেকেই শত ব্যস্ততা পেছনে ফেলে ৩১ শে ডিসেম্বর সকালে স্কুল-মাদ্রাসার ছোট্ট শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে তাদের নিয়ে খেলায় মেতেছিলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিন গণভবনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ইবতেদায়ী জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও দেশব্যাপী বই উৎসবের উদবোধন করেন তিনি। ফল প্রকাশ ও বই উৎসবের এই অনুষ্ঠানে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল শিশুরাও অংশ নেয়। ফল প্রকাশের পর বই উৎসবে শিশুদের হাতে নতুন বই তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। এ অনুষ্ঠানে গণভবনে উপস্থিত সবার উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি কিন্তু বাচ্চাদের সাথে ফটোসেশন করব। এরপর বাইরে গিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে কনফারেন্স রুমের গেটে ফটোসেশন করলেন তিনি। সেখানে থাকা কয়েকজন প্রতিবন্ধী শিশুকে বুকে টেনে আদর করেন প্রধানমন্ত্রী।

এসময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মণি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন। শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

শিশুদের যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার শিক্ষা দিতে হবে

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আগামী প্রজন্মকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা সব ধরনের শিক্ষায় পারদর্শী হয়। সেই শিক্ষাটা আমরা দিতে চাই, যাতে তারা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। এটাই আমাদের লক্ষ্য। শিশুদের পড় পড় না বলে খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের পড়াশুনা শেখাতে হবে। তবেই তা ফলপ্রসূ হবে। শিক্ষার্থীরা যেন চাপমুক্ত থেকে আনন্দের সাথে লেখাপড়ায় আগ্রহী হয় সে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩১ শে ডিসেম্বর গণভবনে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এবং জুনিয়র সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফল হস্তান্তর এবং শিক্ষার্থীদে হাতে নতুন বছরের নতুন বই তুলে দিয়ে বই বিতরণ কার্যক্রম উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। জেএসসি, জেডিসি এবং পিইসি পরীক্ষায় কৃতকার্য সকল শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী।

শিশুর নিরাপত্তা ব্যাহত হলে ১০ লাখ টাকা জরিমানা

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে (ডে কেয়ার সেন্টার) শিশুর নিরাপত্তা ব্যাহত হলে বা ঘাটতি হলে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে। অন্যান্য শর্ত ভঙ্গ করলেও আলাদা আলাদা জেল-জরিমানার বিধান রেখে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২০-এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ২৭ শে ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে প্রস্তাবিত এই আইনের খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। পরে সংবাদ সম্মেলন করে সভার সিদ্ধান্ত জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। এর মধ্য দিয়ে দেশে প্রথমবারের মতো আইনের আওতায় আসছে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র। ■

নতুন বই

মো. নিয়াজ আহমেদ

নতুন বই হাতে নিয়ে
যাবে খোকা খুকু স্কুলে
মজার খেলা খেলবে মাঠে
নতুন নতুন বন্ধু মিলে।

ছুটি শেষে দলবেঁধে
ফিরবে তারা বাড়ি
মিলে মিশে থাকবে ওরা
নেই তো কোনো আড়াআড়ি।

৭ম শ্রেণি, কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা।

বইয়ের আনন্দ

সাবরিনা খাতুন

নতুন বছর আসলে পরে
মিলে নতুন বই
আরো মিলে স্কুলেতে
নতুন মুখের হইচই।

নতুন জামা নতুন বই
নেই তো খুশির শেষ
সবখানেতে ছড়িয়ে যায়
এই খুশির রেশ।

৮ম শ্রেণি, বাগেরহাট সরকারি স্কুল, বাগেরহাট

বিশেষ শিশুদের জন্য ভালোবাসা

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বিশেষ শিশু বা অটিজম শিশুদের জন্য অনেক ভালোবাসা। অটিজম শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ হতে, যার অর্থ আত্ম বা নিজ। 'অটিজম' বলতে শিশুর মানসিক সমস্যাকে বোঝানো হয়। অটিজম কোনো রোগ নয়। এটি একটি মানসিক বিকাশঘটিত সমস্যা। যা স্নায়ু বা স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও পরিবর্ধনজনিত অস্বাভাবিকতার ফলে হয়। অটিজমে আক্রান্ত শিশুর স্বাভাবিভাবে বেড়ে উঠতে অসুবিধা হয়। অটিজমের জন্য কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি ও আচরণ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক ও ভাষার উপর দক্ষতা কম থাকে। সাধারণত ১৮ মাস থেকে ৩ বছর সময়ের মধ্যেই এই সমস্যার লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। শারীরিক উন্নতির সোপানসমূহের বিলম্বিত হওয়া ৬ মাস বয়স থেকেই শুরু হয়। তাই একটু সচেতন হলেই ছয় মাস থেকে এক বছর বয়সের মধ্যেই বাবা-মা তার সন্তানের অটিজম সমস্যা আছে কিনা তা বুঝতে পারেন। ফলে সন্তানকে দ্রুত চিকিৎসা সেবার আওতায় নেওয়া যায়।

অটিজমের নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। পরিবেশগত ও বংশগত কারণেও এই সমস্যা হতে পারে। সাধারণত জটিলতা, লক্ষণ অথবা তীব্রতার উপর নির্ভর করে এর কারণগুলো বিভিন্ন হতে পারে। এছাড়া ভাইরাল ইনফেকশন, গর্ভকালীন জটিলতা এবং বায়ু দূষণকারী উপাদানসমূহ স্পেক্ট্রাম ডিজঅর্ডার হওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন জিনের কারণে অটিজম স্পেক্ট্রাম ডিজঅর্ডার হতে পারে। জেনেটিক বা জিনগত সমস্যা বংশগতও হতে পারে। আবার নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়াও হতে পারে।

বিশেষ শিশুরা কখনো কখনো বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে থাকে। বিশেষ কোনো বিষয়ে তারা অনেক জ্ঞানী হয়। তবে অন্য শিশুদের মতো

এদের জ্ঞান সবদিকে সমান হয় না। এদের কারো থাকে গণিতের ওপর অসাধারণ জ্ঞান, কারো বিজ্ঞান, কেউ বা অসাধারণ ছবি আঁকতে পারে। কেউ হয়ত মুখস্থবিদ্যায় খুব প্রখর হয়। তাই এই বিশেষ শিশুকে ঠিকমতো পরিচর্যা করলে বেড়ে উঠতে পারে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে।

বিশেষ শিশুদের জন্য পিতামাতাই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং শিক্ষক। এই শিশুদের জন্য করণীয় কিছু কাজ উল্লেখ করা হলো-

ভাষা বিকাশের জন্য করণীয়

১. শিশুর সঙ্গে বেশি বেশি কথা বলা, ২. শিশুর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা, কথা বলার সময় তার সমান্তরালে থাকা এবং যে-কোনো কিছুতেই যৌথ মনোযোগ দেওয়া, ৩. কিছু ছোটো ও সহজ শব্দ শেখানো, ৪. শেখানো শব্দ প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করা, ৫. ছবি, বই, জিনিসপত্র ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়ে পরিচয় করানো ও কথা শেখানো।

সামাজিক বিকাশের জন্য করণীয়

১. সমবয়সি ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিশতে ও ভাবের আদান-প্রদান করতে শেখানো, ২. সকল ধরনের সামাজিক পরিবেশে নিয়ে যাওয়া, ৩. শিশুকে প্রয়োজনীয় সামাজিক আচরণগুলো শেখানো।

স্বাবলম্বীতা বিকাশের জন্য করণীয়

১.শিশুকে তার বয়স ও বুদ্ধির মান অনুযায়ী ব্যক্তিগত দক্ষতা শেখানো যেমন- নিজ হাতে খাওয়া, দাঁত মাজা, জামা-জুতো পরা, চুল আঁচড়ানো, যথাস্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা, পেনসিল-কলম দিয়ে আঁকিবুঁকি করাসহ দরকারি জিনিসগুলো ব্যবহার করা। হালকা ব্যায়াম শেখানো।

অটিজম শিশুর সঙ্গ কোনোভাবেই ভিন্নভাবে দেখা যাবে না। বরং তার সঙ্গ ভালোভাবে উপভোগ করতে হবে। শিশুকে বোঝানো যাবে না যে সে অন্যের চেয়ে আলাদা। বরং তাকে বোঝাতে হবে সে অন্য আর দশজনের মতোই প্রিয়। তাদের বিকাশ এবং জীবনযাপনের ক্ষেত্রে পিতামাতাকে সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। ■

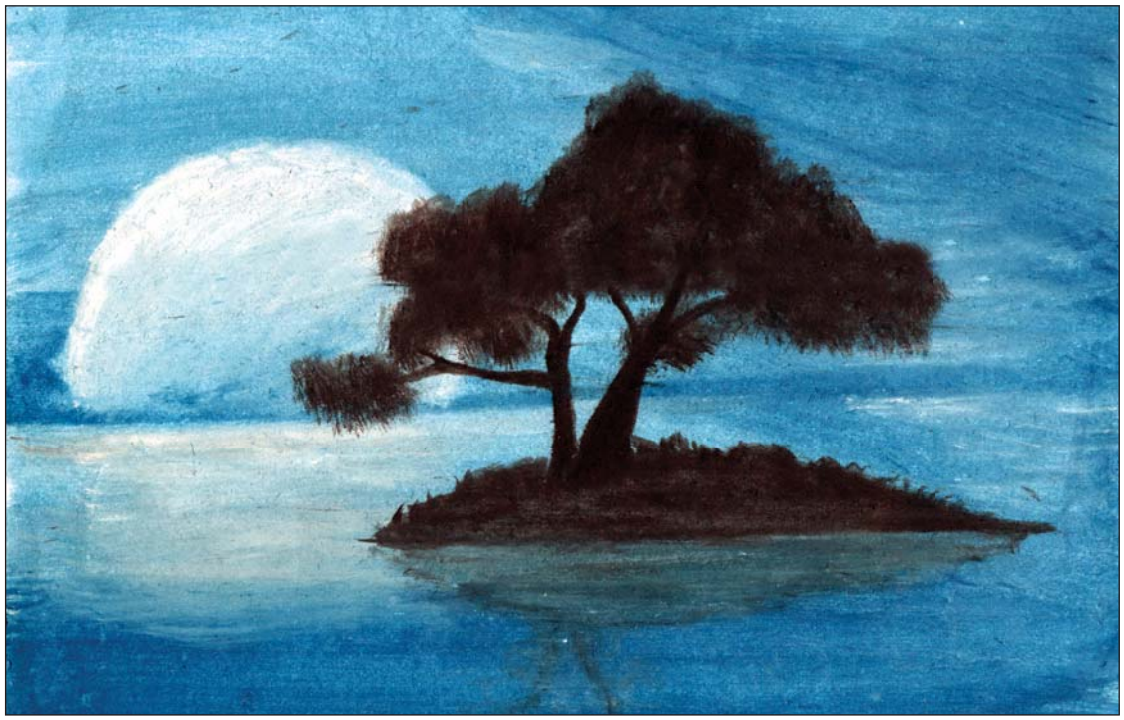

মো. ইসফাক কাদের, নবম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

করোনা ভাইরাস থেকে সাবধান

মো. জামাল উদ্দিন

সর্দি, হাঁচি-কাশি, শ্বাসকষ্ট, গলাব্যথা ও জ্বরকে অবহেলা করা যাবে না। কারণ, এসব করোনা ভাইরাস সংক্রমণেরও লক্ষণ হতে পারে। করোনা ভাইরাস এমন একটি ভাইরাস- যা এর আগে কখনো মানুষের মধ্যে ছড়ায়নি। এটি অত্যন্ত দ্রুত ছড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেছেন যে, এ ভাইরাস একজন মানুষের দেহ থেকে আরেকজন মানুষের দেহে ছড়াতে পারে।

ভাইরাসটি মানুষের ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায় এবং শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমেই একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে ছড়ায়। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে ঘন ঘন উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর দেখা দিবে। জ্বরের পর দীর্ঘমেয়াদি কাশি থাকবে। শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। বয়স্কদের শারীরিক অসুস্থতাবোধ করা, মাথাব্যথা, বিশেষ করে শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত রোগে ভুগবে। ভাইরাসটির আরেক নাম ২০১৯-এনসিওজি করোনা ভাইরাস, একটি নতুন প্রজাতির ভাইরাস। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভাইরাসটি হয়ত ইতিমধ্যেই 'মিউটেট করেছে' অর্থাৎ নিজে থেকেই জিনগত পরিবর্তন করে নতুন রূপ নিচ্ছে। যার ফলে এটি আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই এই ভাইরাস যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য সর্বোচ্চ সতর্ক ব্যবস্থা রাখছে বাংলাদেশ।

বন্ধুরা, তোমাদের সর্দি, হাঁচি-কাশি, শ্বাসকষ্ট গলা ব্যথা ও জ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নেবে। একই সঙ্গে এসব উপসর্গ দেখা দিলে ঘর থেকে বাইরে বের হওয়া যাবে না। বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। এসব উপসর্গের চিকিৎসা নিলে দ্রুত সুস্থ হওয়া যায়। তবে অহবেলা করলে এই উপসর্গ প্রাণঘাতী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ:

যত বেশি পারো তোমার কণ্ঠনালিকে ভিজিয়ে রাখো। কোনো অবস্থাতেই শুষ্ক হতে দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ

তৃষ্ণা পেলেই পানি পান করো। কণ্ঠনালি যদি শুষ্ক থাকে তবে মাত্র ১০ মিনিটেই তুমি এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারো।

৩০ থেকে ৫০ সিসি বা এমএল হালকা গরম পানি ছোটোদের জন্য এবং ৫০ থেকে ৮০ সিসি বা এমএল বড়োদের পানি পান করতে হবে। যখনই তুমি মনে করবে তোমার কণ্ঠনালি শুকিয়ে আসছে, অপেক্ষা না করে দ্রুত পানি পান করো। সবসময় হাতের কাছে বিশুদ্ধ পানি রাখো। একবারে প্রচুর পানি পান করে লাভ নেই। অল্প অল্প বিরতিতে অল্প অল্প পানি পান করে কণ্ঠনালিকে সবসময় ভেজা রাখতে হবে। মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত এই নিয়মগুলো মেনে চলো।

করোনা ভাইরাস থেকে যেভাবে সাবধান থাকবে : যেহেতু করোনা ভাইরাসটি নতুন, তাই এর কোনো টিকা বা ভ্যাকসিন এখনো নেই এবং এমন কোনো চিকিৎসা নেই যা এ রোগ নির্মুল করতে পারে। একমাত্র উপায় হলো, যারা ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছে বা এ ভাইরাস বহন করছে- তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা। ঘরের বাইরে মাস্ক ব্যবহার করা। গণপরিবহন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা, প্রচুর ফলের রস এবং পর্যাপ্ত পানি (হালকা গরম) পান করা। ঘরে ফিরে হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নেওয়া। কিছু খাওয়া বা রান্না করার আগে ভালো করে হাত ধুয়ে নেওয়া। ডিম কিংবা মাংস রান্না করার সময় ভালো করে সেদ্ধ করে নেওয়া। ময়লা কাপড় দ্রুত ধুয়ে ফেলা। আমরা এসব সতর্কতা মেনে চলব। করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে রক্ষা করব। ■

আমার গ্রাম

আফিয়া ইবনাত

সাতসকালে গাছিরা সব
গাছে গাছে রস নামাতে ব্যস্ত
বাড়ি বাড়ি পিঠা-পুলি আর
নলেনগুড়ের গন্ধে ভরা হস্ত।

দূর্বা ঘাসে শিশির বিন্দু হাসে
সেদিনের সেই প্রাতঃভ্রমণ
অনেক মজার, গ্রামটি আমার
আজও চোখে ভাসে।

মাঠের পরে মাঠ পেরিয়ে
হলুদ শুধুই হলুদ ফুলে ভরা
মৌমাছিরা গুনগুনিয়ে ঘোরে ফুলে ফুলে
মনের সুখে সাজায় বসুন্ধরা।

নবম শ্রেণি, পি.এন সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী।

জেএসসি ও পিইসি দুটোতেই মেয়েরা এগিয়ে

জান্নাতে রোজী

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় ফলাফলের মূল দুই সূচকে পাসের হার ও জিপিএ-৫ দুটোতেই ছেলেদের চেয়ে ভালো করেছে ছোট্ট মেয়েরা। ৩১শে ডিসেম্বর প্রকাশিত ফলাফলে মেয়েদের এ সাফল্য লক্ষ করা যায়।

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় জেএসসি মেয়েদের পাসের হার ৮৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। আর ছেলেদের পাসের হার ৮৬ দশমিক ৭২ শতাংশ। জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক দিয়েও এগিয়ে মেয়েরা। মোট জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৪ হাজার ৯১৮ জন মেয়ে। আর ছেলে ৩১ হাজার ৮২৯ জন।

পিইসি পরীক্ষায় মেয়েদের পাসের হার ৯৫ দশমিক ৬১ শতাংশ। আর ছেলেদের পাসের হারও ৯৫ দশমিক ৩৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক দিয়ে মেয়েরা এগিয়ে। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়ে ১ লাখ ৮৪ হাজার ৬৩৭ জন এবং ছেলে ১ লাখ ৪১ হাজার ৪৫১ জন।

বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেবে সরকার

১৮ বছরের কম বয়সের অবিবাহিত অসচ্ছল মেয়েদের সরকার বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেবে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অন্যতম বিষয় যৌন ও প্রজনন শিক্ষা। নিরাপদ স্যানিটেশনের বিষয়টি সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে

এবং নতুন করে স্থাপিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টয়লেটের ব্যবস্থা করবে। ১১ই জানুয়ারি রাজধানীর এফডিসিতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন, নারী শিক্ষার প্রসার এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্প্রাসারণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা সুরক্ষার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

সৌদিতে বাল্যবিবাহ বন্ধ হচ্ছে

সমাজ সংস্কারের অংশ হিসেবে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে নতুন এক আদেশ জারি করেছে সৌদির বিচার মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে নিম্ন আদালতের উদ্দেশ্যে এ আদেশ জারি করেছেন দেশটির আইনমন্ত্রী ও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিরের চেয়ারম্যান শেখ ওয়ালিদ আল সামানি।

আদেশে বলা হয়েছে, ১৮ বছরের কম বয়সি নারী বা পুরুষ কেউ বিয়ের আবেদন করলেই তার অনুমোদন দিতে পারবে না নিম্ন আদালত। ওই অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী বা পুরুষের বিয়ে দেওয়া ঠিক হবে কি না, সে সিদ্ধান্ত নেবে ওই আদালত।

উল্লেখ্য, গত জানুয়ারিতে শিশু রক্ষা সংশোধনী আইন পাস হয় সৌদি আরবের শুরা কাউন্সিলে। নতুন ওই আইনে ১৫ বছরের কম বয়সিদের বিয়ে পুরোপুরি নিষিদ্ধ এবং যাদের বয়স ১৬ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে, তাদের বিষয়ে নতুন নিয়ম চালু করা। আর সেই নতুন নিয়ম হলো বিশেষ আদালত এখন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবে। ■

তাশদিদ তাবাসুম, দ্বিতীয় শ্রেণি, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মো. ইহসানুল হক সিফাত, কেজি ওয়ান, লিটল অ্যাঞ্জেল স্কুল, ঢাকা

সানজিদা আক্তার রূপা, ষষ্ঠ শ্রেণি, সাউথ সন্দ্বীপ আবেদা ফয়েজ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধাঁ

পাশাপাশি: ১. বাকু যে দেশের রাজধানী, ৪. নাকাল, ৬. নয়নমণি, ১০. পানিতে শরীর ডুবিয়ে গোসল

উপর-নিচ: ১. আফ্রিকা মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র, ২. পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি জেলা, ৩. বাতাবি লেবু, ৫. পত্র, ৭. নতুন, ৮. রাজ্যশাসন নীতি, ৯.এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র

১			২		৩		
৪							
						৫	
			৬		৭		৮
		৯					
	১০						

ব্রেইনইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৯	/		+	২	=	
-		-		*		-
	/	২	-		=	১
/		*		-		+
৪	*		-	৫	=	
=		=		=		=
	+	৩	-		=	৯

উত্তর

আ	জা	র	বা	ই	জা	ন	
ল			ন্দ		ম্বু		
জে	র	বা	র		রা		
রি			বা			পা	
য়া			ন	য়	ন	তা	রা
		ত			তু		জ
	অ	ব	গা	হ	ন		নী
		লা					তি

সমাধান

৯	/	৯	+	২	=	৩
-		-		*		-
৮	/	২	-	৩	=	১
/		*		-		+
৪	*	৩	-	৫	=	৭
=		=		=		=
৭	+	৩	-	১	=	৯

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হলো।

সংকেত: প্রতিনিয়ত, কানন, অধিনায়ক, নরম, বধির, নীতিবান, মা, রসগল্প, আকাশ, বিকাল, সুগম

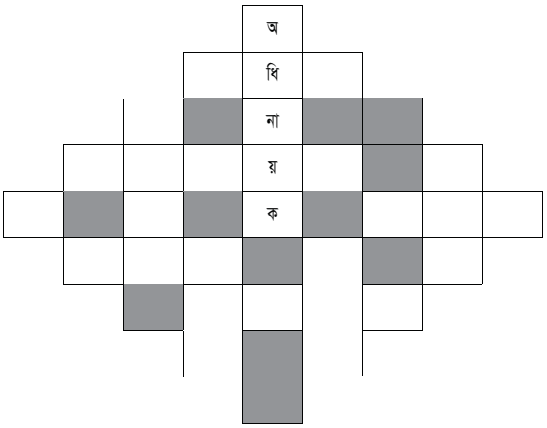

সমাধান:

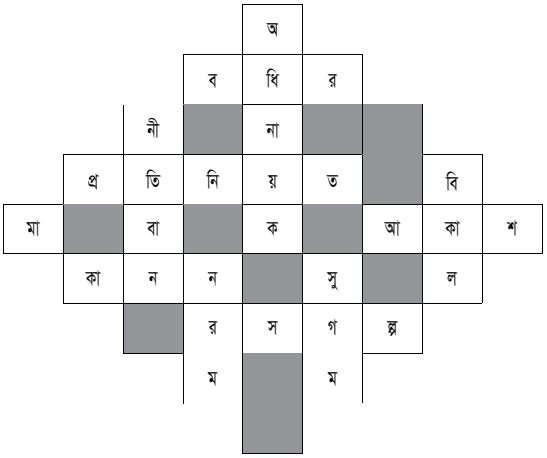

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার কওে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৪৫		৪৩		৩৯	১৮			১৫
	৪৭		৪১			২২		
৪৯		৫৩			২০		২৪	
	৫১		৫৫	৩৬		২৬		
৭৩		৭৫			৩৪		২৮	
	৮১			৩২		৩০		
			৫৮		৬০	১		
		৭৮		৬৪			৩	
৬৯			৬৬		৬২	৫		৭

সমাধান

৪৫	৪৪	৪৩	৪০	৩৯	১৮	১৭	১৬	১৫
৪৬	৪৭	৪২	৪১	৩৮	১৯	২২	২৩	১৪
৪৯	৪৮	৫৩	৫৪	৩৭	২০	২১	২৪	১৩
৫০	৫১	৫২	৫৫	৩৬	৩৫	২৬	২৫	১২
৭৩	৭৪	৭৫	৫৬	৩৩	৩৪	২৭	২৮	১১
৭২	৮১	৭৬	৫৭	৩২	৩১	৩০	২৯	১০
৭১	৮০	৭৭	৫৮	৫৯	৬০	১	২	৯
৭০	৭৯	৭৮	৬৫	৬৪	৬১	৪	৩	৮
৬৯	৬৮	৬৭	৬৬	৬৩	৬২	৫	৬	৭

সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায়

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইল: editornobarun@dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
bdqtrly2@gmail.com

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্যভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-44, No-7, January 2020, Tk-20.00

শুচী ইসলাম, অষ্টম শ্রেণি, মহেশপুর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্যভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা